অমলা দেবী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

ছায়াছবি

কাল—রাত এগারোটা। স্থান—কলকাতার একটি অভিজাত পল্লীতে একটি সুবৃহৎ তেতলা বাড়ির তেতলায় একটি সুপরিসর কক্ষ। কক্ষটি গৃহস্বামীর লাইব্রেরি-ঘর। চারিদিকে বড় বড় আলমারি। নানা রকমের বইয়ে ঠাসাই। গৃহস্বামীর নাম কলকাতা শহরে তথা বাংলা দেশে, এমন কি বাংলার বাইরেও, সুপরিচিত। সার জে. পি. চ্যাটার্জি। স্বাধীনতা পাবার পর 'সার' বর্জিত হয়ে 'শ্রী'যুক্ত হয়েছে। শ্রীজগদীশ-প্রসাদ চ্যাটার্জি। যে কজন বাঙালী ব্যবসায়ী ব্যবসাক্ষেত্রে খ্যাতনামা অবাঙালী ব্যবসায়ীদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

ছায়াছবি

কক্ষের মাঝখানে একটা ঈজি-চেয়ারে জগদীশপ্রসাদ উপবিষ্ট। মুখে ধূমায়মান সিগার। ডান পাশে একটা টিপয়ে একটি বিলাতী মদের বোতল ; কাচের গ্লাস একটি ; তাতে পানীয় কিছুটা রয়েছে। ঈজি-চেয়ারের ডান হাতলের উপর একটা ছাইদান। কোলের উপর গাঢ় নীল রঙের ভেলভেটে বাঁধানো অ্যালবাম। প্রচ্ছদপটে সোনালী অক্ষরে নাম লেখা—সার্ জে. পি. চ্যাটার্জি। 'সার্' নির্বাসিত হয় নি এখান থেকে।

অ্যালবামে ছবি দেখছেন জগদীশপ্রসাদ। নানা বয়সের ছবি। জীবনের নানা খণ্ডের নির্দেশ-পট। জীবনে যেদিনই কোন নূতন সাফল্য অর্জন করেন, সেদিনই একবার সমস্ত জীবনটার উপরে চোখ বুলিয়ে নেন। বর্তমানের নবনির্মিত জয়-স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে, সুদূরপ্রসারী অতিক্রান্ত জীবন-পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আজও জীবনের স্মরণীয় দিন। নূতন একটি জয়-স্তম্ভ রচিত হয়েছে আজ। শ্রেষ্ঠী-সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। পরম গৌরবময় ভবিষ্যতের প্রথম সোপানে পা দিয়েছেন। শহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। সভা হয়েছে, সভাতে তাঁর গুণকীর্তন ক'রে বক্তৃতা হয়েছে ; সভান্তে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা। ছবি তোলাও হয়েছে। ছবি

তৈরি হয়ে গেছে এরই মধ্যে। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীমতী এলসি ইতিমধ্যে কখন এসে ছবিটি অ্যালবামে যথাস্থানে এঁটে দিয়ে গেছে।

অ্যালবাম খুলে প্রথম ছবিটি দেখছেন। ত্রিশ বৎসর আগের ছবি। সেনেট হলে কনভোকেশনে গিয়েছিলেন বি. এ. পাসের ডিপ্লোমা নেবার জন্যে। ফিরতি পথে দুজন বন্ধুর সঙ্গে হ্যারিসন রোডে জনৈক ফোটোগ্রাফারের স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলিয়েছিলেন। তিনজনে তিনটি চেয়ারে বসেছেন। তিনি মাঝখানে, বন্ধু দুজন দুপাশে। তিনজনেরই পরনে অনুষ্ঠানোচিত পোশাক। হাতে ডিপ্লোমা। তখন তাঁর বয়স আঠারোর বেশি নয়। পাতলা ছিপছিপে একহারা চেহারা। যৌবনের উন্মেষ হয়েছে বটে, কিন্তু কৈশোরের লাবণ্য মুখ থেকে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি। মুখে নব্য-গ্রাজুয়েটোচিত গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মনের আনন্দ চোখ দুটিকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

সেই সব দিনের কথা মনে পড়ল। মনে কত আশা, কত রঙিন কল্পনা! এম. এ. পাস করবেন। প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে সরকারী চাকরি পাবেন। দিন দিন পদোন্নতি। মাইনের অঙ্ক তিন অঙ্ক ছাড়িয়ে ক্রমে চার অঙ্কে উঠবে, ক্রমে আরও বাড়বে। সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী। সুশ্রী

ছেলেমেয়ে। প্রত্যেকটি প্রতিভাবান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করবে সব। বড় বড় সরকারী চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলা দেশে একটি নূতন অভিজাত-বংশের পত্তন করবেন তিনি। এমনই ধারা কল্পনার মালা গাঁথতেন কত ছুটির দিনের স্তব্ধ দুপুরে, মেসের ছোট ঘরটিতে জারুল কাঠের চৌকির উপরে পাতলা মলিন শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে। কোন কোন দিন রাত্রে ভাবী জীবনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে রাত্রি শেষ হয়ে যেত, ঘুম আসতে চাইত না ; মাথায় মুখে চোখে জল দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে হ'ত।

দ্বিতীয় ছবি উল্টোলেন জগদীশপ্রসাদ। আরও তিন বৎসর পরের ছবি। যৌবন এসে গেছে। কীর্তিহীন, বৈভবহীন, প্রাণোচ্ছ্বাসহীন। যেন ভরা শ্রাবণে স্রোতহীন নদী। যেন ভরা বর্ষায় জরাগ্রস্ত নবীন লাউলতা—এর মধ্যেই মরতে শুরু ক'রে দিয়েছে, মাটি হতে প্রাণদ রস আহরণ করবার শক্তি হারিয়েছে। বিবর্ণ রুগ্ন কুৎসিত।

বি. এ. পাস ক'রে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। বাবা মারা গেলেন বৎসরখানেক পরে। মাথার উপরে সংসারের ভার পড়ল। বিধবা মা, দুটি ছোট ভাই, একটি অবিবাহিতা বোন। পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে হ'ল। চাকরি জুটল অনেক কষ্টে। গোপালগঞ্জ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক। গঞ্জ

জায়গা। পাশেই নদী। বোর্ডিঙে থাকতেন। ছেলেরা বড় ভালবাসত। একটি ছোট ছেলেকে মনে পড়ল। বছর দশ বয়েস। তাঁর ঘরেই থাকত। তিনি থাকতেন খাটের ওপরে। সেই ছেলেটি ও আর একটি ছেলে দুজনে মেঝেতে থাকত। ছেলেটি খুব শ্রদ্ধা করত তাঁকে। গোপালগঞ্জে ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রাদুর্ভাব। তাঁকেও ম্যালেরিয়া ধরেছিল। প্রায় জ্বর হ'ত। ছেলেটি খুব সেবা করত তাঁর। মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। পা টিপে দিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে। নিজে হাতে সাবু বার্লি এনে দিত রান্নাঘর থেকে। কোন একটা কাজ করতে বললে যেন কৃতার্থ হয়ে যেত। এমনই নিজে থেকে কত কাজ ক'রে দিত। বিছানা পেতে দিত। স্নানের পর ভিজে কাপড় শুকোতে দিত। স্কুল থেকে ফিরেই শুকনো কাপড় তুলে গুছিয়ে আলনায় রাখত। বার বার নিষেধ সত্ত্বেও জুতোয় কালি দিয়ে দিত নিয়মিতভাবে। ওই বয়সেই বেশ গোছালো ছিল ছেলেটি। বুদ্ধিমানও বটে। ক্লাসে প্রথম হ'ত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিল নাকি! আরও কত ছেলের কথা মনে পড়ল। চোখ বুজে তাদের চেহারা মনে আনবার চেষ্টা করলেন। এল না। জাগ্রত চৈতন্য থেকে স'রে গিয়ে অন্তশ্চেতনায় আত্মগোপন ক'রে আছে সব। স্বপ্নে হয়তো দেখা দেবে কোনদিন, দেখা

হয়তো দিয়েছে কতবার। শুধু কি ওদের ছবি? আর একজনেরও। চোখ বুজলেন। মনের পটে জ্বলজ্বল ক'রে ফুঠে উঠল সেই ছবি।

স্কুলের ছেলেদের নিয়ে একটি 'অনাথ ভাণ্ডার' স্থাপন করেছিলেন। প্রতি রবিবার ছেলেদের নিয়ে ভিক্ষায় বেরোতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। বাড়িতে বাড়িতে ভিক্ষা করতেন। যে যা পারত দিত। কেউ শুধু চাল, কেউ কেউ তার সঙ্গে আনি, তুয়ানি, সিকি অথবা আধুলি। তার বেশি কেউ দিত না। প্রত্যেকটি দান সমান আগ্রহে তাঁরা গ্রহণ করতেন। এর ফলে ওই অঞ্চলে খুব সুনাম ছড়িয়েছিল তাঁর। লোকে বলাবলি করত, একজন শিক্ষকের মত শিক্ষক এসেছেন এতদিন পরে। ছেলেগুলো হয়তো মানুষ হয়ে উঠবে, যদি উনি থেকে যান এখানে। ওই ছোট ছেলেটির গ্রামে গিয়েছিলেন একদিন। ছেলেটিও সঙ্গে গিয়েছিল। মধ্যাহ্নে স্নানাহারের ব্যবস্থা হ'ল ছেলেটির বাড়িতে। বাড়িতে শুধু বিধবা মা ও একটি অবিবাহিতা বোন। মেয়েটির নাম অতসী। শ্যামাঙ্গী, কিন্তু চমৎকার মুখশ্রী। মাকে প্রণাম করেছিলেন। মা আশীর্বাদ করেছিলেন—রাজা হও বাবা। আশীর্বচন শুনে মনে মনে হেসেছিলেন। পাড়াগাঁয়ের স্কুলে পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাস্টারকে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ! অতসী প্রণাম করল

তাঁকে। ছেলেটি পরিচয় ক'রে দিল, আমার দিদি। মা বললেন, আশীর্বাদ কর বাবা, যেন ভাল বর হয়। আসবার সময়ে মা সানুনয়ে বললেন, আবার এস বাবা। অতসী মুখে কিছু বলে নি। ওর চোখের দৃষ্টি নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

মাস কয়েক পরে, জন্মাষ্টমীর ছুটি হ'ল। দু দিন মাত্র। ছেলেটি বললে, মা আপনাকে যেতে বলেছেন। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হ'ল, তোমার দিদি যেতে বলেন নি! ইচ্ছা দমন করেছিলেন। গিয়েছিলেন ছেলেটির সঙ্গে। দু দিন ছিলেন। সেবারে মা বলেছিলেন, দাও না বাবা, একটি ছেলে যোগাড় ক'রে। মাথার ওপরে কেউ নেই আপনার বলতে। কে খোঁজ-খবর করবে! ইতিমধ্যে কৌলিক পরিচয়ের আদান-প্রদান হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ওদের স্বঘর অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ হওয়া চলত। মা তবু তাঁকে স্পষ্ট অনুরোধ করতে সাহস করেন নি। ঘুরিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের বাড়িতেই যদি কোন ভাল ছেলে থাকে তাই দাও না যোগাড় ক'রে—লেখাপড়া জানে, রোজগার-পাতি করে। জন্মাষ্টমীর উপবাস করেছিল মেয়েটি। বিকেলের দিকে মুখখানি শুকিয়ে উঠল। চা ক'রে আনল তাঁর জন্যে। তিনি বললেন, একটু চুপ ক'রে ব'স না। অতসী জবাব দিল না, মৃদু হাসল মাত্র। সেদিন সংসারের সমস্ত কাজ একা করল অতসী। মাকে পূজোর

ঘর থেকে নড়তে দিল্ল না। রাত্রে নানা রকমের খাবার তৈরি করেছিল তাঁর জন্যে। মা সামনে ব'সে যত্ন ক'রে খাওয়ালেন। তিনি বলেছিলেন, আপনারা সারাদিন উপোস ক'রে আছেন। খেয়ে নিন গে। মা বলেছিলেন, তা কি হয় বাবা! কত ভাগ্যে আমাদের বাড়ি এসেছ! অতসী কাছে ছিল না। মায়ের পিছনে একটু দূরে ব'সে ছিল। মুখ তুলতেই দেখতে পেলেন, তাঁরই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ মিলতেই মুখ ফিরিয়ে নিল। সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসে নি। একটি কিশোরী মেয়ের কালো চোখের মুগ্ধ মুখর দৃষ্টি মনের মধ্যে একটি মধুর মোহ বিস্তার ক'রে রেখেছিল।

আরও বার কয়েক গিয়েছিলেন। একবার বিয়ের কথাটা মা সরাসরি পেড়েছিলেন—তুমিই ওকে পায়ে ঠাঁই দাও বাবা। তিনি বলেছিলেন, মায়ের মত না নিয়ে তিনি কোন কথা বলতে পারবেন না। তা ছাড়া তাঁর নিজেরই অবিবাহিতা বিবাহযোগ্যা বোনের বিয়ে হয় নি। তার বিয়ে না দিয়ে তাঁর বিয়ে করা কি ঠিক হবে? মা মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলেছিলেন, তা তো সত্যি বাবা। সক্ষোভে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বামুনের ঘরে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে থাকলে বিধবা মায়ের যে কি ক'রে দিনরাত কাটে ভগবান জানেন।

সে বৎসর ফাল্গুন মাসে পান-বসন্ত হয়েছিল তাঁর। গুটিতে

সারা অঙ্গ ভ'রে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর। সারা দিনরাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতেন। সহকর্মী শিক্ষকেরা, অন্যান্য ছাত্রেরা কেউ পাশ ঘেঁষত না। অতসীর ভাই দিবারাত্র কাছে থাকত, সেবা করত। মা খবর পেয়েই অবিলম্বে যাবার জন্য চিঠি লিখলেন। তিনি প্রথমে রাজী হন নি! ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে কোথাও যাবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর। কারও-বাড়িতে, বিশেষ ক'রে অনাত্মীয়ের বাড়িতে, ওঠবার ইচ্ছা ছিল না। ছেলেটিকে বললেন, তার মাকে বুঝিয়ে চিঠি লিখতে। ছেলেটির চিঠি পেয়েই মা নিজে এসে হাজির হবেন—ব'লে ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে যেতে হ'ল। মায়ের আদর-যত্ন, অকৃত্রিম স্নেহোৎকণ্ঠা, অতসীর প্রাণ-ভরা অক্লান্ত সেবা—এখনও ভুলতে পারেন নি। সেবার তিনি অতসীকে বিয়ে করবেন ব'লে মাকে কথা দিয়েছিলেন। অতসীকেও জানিয়ে-ছিলেন। গুটিগুলো তখন শুকিয়ে উঠেছে। অতসী পাশে ব'সে কি একটা তেল দিয়ে গুটিগুলির মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, অতসী! মাস্টাররা কত গরিব, তুমি জান? অতসী কৌতূহলভরা চোখে তাকাল। তিনি বললেন, আমিও মাস্টার। আমার সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে, সে কোনদিন আরাম পাবে না, ভাল শাড়ি-গয়না পরতে পাবে না, বড় কষ্টে সারাজীবন কাটাতে হবে তাকে। তুমি কি পারবে? লজ্জারক্ত

মুখখানি নামিয়ে অতসী মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি তো কিছু চাই না। তিনি বললেন, কি চাও না? শাড়ি, বাড়ি, গয়না, টাকা? কি চাও তা হ'লে? অতসীর মুখখানি আরও নত হ'ল। কান দুটো লাল হয়ে উঠল। কিছু জবাব দিলে না। তিনি বললেন, শুধু আমাকে চাও? অতসী ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানাল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা যাচ্ছ? অতসী নীরবে বার হয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। বসল পাশে। চোখ দুটিতে অশ্রুর আভাস তখনও লেগে ছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কাঁদছিলে নাকি? ক্ষীণ মিষ্ট হাসি ফুটে উঠল অধরোষ্ঠে। জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদলে কেন? অতসী বললে এবার, কি জানি, কেন কান্না পেল!

অতসীকে ভাল লেগেছিল তাঁর। খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু ভারি শান্ত মিষ্ট স্বভাব। দীপ্ত দৃপ্ত মধ্যাহ্ন নয়, কোমল নম্র সন্ধ্যা। অতসী যার জীবনের মধ্যে যাবে, সে জীবনকে ও সুখী করবে, তৃপ্ত করবে—এ বিশ্বাস তাঁর হয়েছিল। ওকে বিয়ে করলে তাঁকে হয়তো সারাজীবন পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি ক'রেই কাটিয়ে দিতে হ'ত। দুর্দম দুরাশার পাখা মেলে জীবনের উচ্চতম শৃঙ্গে উত্তীর্ণ হবার দুঃস্বপ্ন দেখতেন না কোনদিন। পাড়াগাঁয়ের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতার মধ্যে, ক্ষীণ দীপশিখার মত,

অখ্যাত অবজ্ঞাত জীবনযাপন ক'রে একদিন নিবে যেতেন। তাঁর মৃত্যু অতি সাধারণ নগণ্য ব্যাপারের মত, ক্ষীণ তরঙ্গ তুলে, পল্লীবাসীদের মনের তীরে মৃদু আঘাত করত—মাস্টার মশায় আজ গেলেন। ভারি ভাল-মানুষ ছিলেন।

অতসী বেঁচে থাকলে ওকে নিশ্চয় বিয়ে করতেন। অল্পদিন পরেই মারা গিয়েছিল। টাইফয়েড হয়েছিল। অনেক দিন ভুগেছিল। তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। ছুটির পরে ফিরে গিয়ে দেখলেন, ছেলেটি আসে নি। একটু বিস্মিত হলেন, চিন্তিতও হলেন। কয়েক দিন পরে ছেলেটি এল। বললে, দিদির অসুখ হয়েছে। আপনাকে একবার যেতে হবে মাস্টার মশায়। দিদি দেখতে চাচ্ছে। দিদি বোধ হয় বাঁচবে না।—ছেলেটি কেঁদে ফেললে। তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। অতসীর রোগশয্যার পাশে বসেছিলেন। জ্ঞান ছিল না। বিড় বিড় ক'রে ভুল বকছিল। বোঝা যাচ্ছিল না কিছু। হঠাৎ তীব্র প্রতিবাদের সুরে স্পষ্টকণ্ঠে ব'লে উঠল, আমি যেতে পারব না বলছি যে! কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে যেন কাকে বুঝিয়ে বললে, ওঁকে ছেড়ে, খোকাকে ছেড়ে কি যেতে পারি? মা পাশেই ছিলেন। নীরবে কাঁদছিলেন। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললেন, ঐ ধরনের কথা বলছে শুধু। ওর ধারণা হয়েছে, ওর বিয়ে হয়ে গেছে তোমার সঙ্গে। একটি খোকা হয়েছে। কখনও বলছে—খোকাকে নাও না

একটিবার। শুধু লেখাপড়া রাতদিন! কখনও বলছে—আমার মত সুখী কে আছে? এমন স্বামী, এমন ছেলে—। কাছে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলেন মা, শুনছিস, কে এসেছে দেখ। অনেকক্ষণ প'রে চোখ ফিরিয়ে অতসী তাকাল তাঁর দিকে। চিনতে পারলে না।

সেদিন রাত্রে মারা গেল অতসী। গাঁয়ের ধারে ছোট নদীর বুকে শেষকৃত্য হ'ল তার। স্কুলে ফেরবার সময়ে মা সাশ্রুচক্ষে সানুনয়ে অনুরোধ করলেন, সম্পর্ক কাটিয়ে দিও না বাবা। ছুটি-ছাটাতে একবার ক'রে এসে হতভাগীকে দেখা দিও।

এর কিছু দিন পরেই স্কুল থেকে চ'লে এসেছিলেন। ছেলেরা বিদায়-সভার আয়োজন করল। কবিতা পাঠ হ'ল, বক্তৃতা হ'ল সভাতে। অতসীর ভাই এক পাশে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ছবি তোলা হ'ল।

ছবিটির উপরে আবার দৃষ্টিক্ষেপ করলেন জগদীশপ্রসাদ। ছেলেটি তাঁর পায়ের কাছে ব'সে আছে। আসবার সময়ে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে ছেলেটিও তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল। ট্রেনে ওঠবার আগে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে প্রণাম করেছিল তাঁকে। সব ছাত্রকে যেমন মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, ওকেও তেমনই করেছিলেন। ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ওর কোমল কান্ত মুখখানিতে একটি স্নেহচুম্বন দিয়ে

ওকে বিশেষভাবে আদর করতে ইচ্ছা হয়েছিল। লজ্জায় দ্বিধায় পারেন নি। ট্রেন ছাড়তেই ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। সেই কান্নার শব্দ রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল তাঁকে। গ্রামপ্রান্তে নদী পার হবার সময়েও সেই কান্না স্পষ্ট কানে বাজতে লাগল। মনে হ'ল, অন্ধকারে নদীর বুকে দাঁড়িয়ে অতসী কাঁদছে।

ঈজি-চেয়ারে অর্ধশয়ান হয়ে চোখ বুজলেন জগদীশপ্রসাদ। অতসীর মুখখানি স্মৃতিপটে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলেন। আর পারলেন না। অতসীর স্মৃতি চেতনার গভীর স্তরে গিয়ে লুকিয়েছে। জাগ্রত মন নাগাল পেল না আর। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল তার ভাইয়ের মুখখানি। ঠিক যেমনটি দেখেছিলেন সেদিন—বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে। হঠাৎ আর একটা ছবি ফুটে উঠল, প্লাটফর্মে উবু হয়ে ব'সে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ছেলেটি কাঁদছে। ওর কোমল কিশোরকণ্ঠের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলেন যেন।

দুই

কয়েকটা পৃষ্ঠা পর পর উল্টোলেন জগদীশপ্রসাদ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাশাপাশি, ওপরে-নীচে অনেকগুলি ছবি। জীবন-কাব্যের তৃতীয় পর্ব। যে জীবন-যুদ্ধে আংশিক জয়লাভ করেছেন এবং পূর্ণ-জয়লাভের পথে পা দিয়েছেন, সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি-পর্ব। কাঁচা লোহা যথামাত্রা অঙ্গার মিশ্রণে ও অগ্নিদহনে কঠিন ইস্পাতে পরিণত হ'ল এই পর্বে।

একটি ছবির উপরে দৃষ্টি পড়ল। পাশাপাশি তিনজন ব'সে। মাঝখানে একজন প্রৌঢ় ইংরেজ, ডান পাশে একটি তের-চৌদ্দ বৎসরের বালক, বাঁ পাশে তিনি। বালক ও তাঁর দুজনেরই পরিধানে ফ্যাশন-দুরস্ত সাহেবী পোশাক। চেহারা বদলে গেছে তাঁর। লম্বা কাহিল শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রসধারাবিচ্ছিন্ন বিবর্ণ শুষ্কপ্রায় লাউচারা উর্বর ভূমিতে স্থানান্তরিত হয়ে প্রচুর রস-আহরণে আবার সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠেছে। প্রৌঢ় ইংরেজ বাংলার বাইরে কোন এক প্রদেশের লাটসাহেব। বালকটি ওই প্রদেশের কোন একটি

ছোট দেশীয় রাজ্যের মৃত রাজার নাবালক পুত্র। বাম পাশে ওই রাজ্যের মন্ত্রী। মাস্টারি থেকে মন্ত্রিত্বে পৌঁছে গেছেন। কুড়েঘর থেকে রাজপ্রাসাদে। অভাবনীয় ভাগ্য-পরিবর্তন।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে কোন এক জেলা-শহরের স্কুলে সহকারী শিক্ষক হয়ে গেলেন। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। দু-চারজন তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল। বিশেষ ক'রে একজন ইংরেজীর অধ্যাপকের সঙ্গে। তাঁরই উৎসাহে, তাঁরই সাহায্যে ইংরেজীতে এম. এ. পাস ক'রে ফেললেন। বৎসরখানেক পরে বাংলার বাইরে কোন প্রদেশের একটা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকের কাজ পেলেন। সেখানে গিয়ে একটা সুযোগ ঘ'টে গেল। কলেজের প্রেসিডেণ্ট জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মিঃ ই. জে. স্মিথ পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করতে এলেন। ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে হ'ল তাঁকে। ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা বললেন। তখন অসহযোগ-আন্দোলন চলছিল সারাদেশ ব্যেপে। দেশের হাওয়া গরম হয়ে উঠেছিল। দেশের লোকের মাথাও। রাজনৈতিক নেতারা ক্ষেপে উঠেছিলেন একেবারে—ইংরেজের শাসন-শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্যে। লেখনী ও রসনা—দু-ই সমান মাত্রায় চালিত হচ্ছিল। তিনি রাজভক্তিতে গদগদ বা দেশপ্রেমে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন

না। ইংরেজদের অথবা স্বাধীনতাকামী নেতাদের প্রশংসা বা নিন্দা করলেন না। তিনি ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, সংগ্রামে যারা যোগ দেবে—তাদের মন শিক্ষিত, বুদ্ধি বিকশিত ও চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদের তা হয় নি। এর জন্যে চাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। আন্দোলনের ঢেউ যদি বিদ্যায়তনের আবহাওয়াকে ক্রমাগত আলোড়িত করতে থাকে, তা হ'লে ছাত্রদের মনুষ্যত্ব-বিকাশে বাধা ঘটবে। চারা গাছের মূল যদি ক্রমাগত ধাক্কা খায়, প্রসারে ও বৃদ্ধিতে বাধা পায়, সে গাছের ভবিষ্যৎ ভাল হয় না। হয় শুকিয়ে যায়, কিংবা বিকৃত-গঠন হয়ে ওঠে। ছাত্রেরা দেশের ভবিষ্যতের ধারক ও বাহক। ভাবী সংগ্রামের যোদ্ধা তারা। দেশ যদি স্বাধীন হয়, দেশ-শাসনের ভার তাদের উপরেই পড়বে। কাজেই তারা যদি নষ্ট হয়ে যায়, জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। এই সুযোগে তিনি ইংরেজদের প্রশংসা করলেন। বললেন, ইংরেজ জাতি তাঁদের ছাত্রদের পরম যত্নে সমস্ত বিক্ষোভ থেকে যথাসাধ্য দূরে সরিয়ে রাখেন। তিনি একথাও বললেন, আমাদের দেশের শাসনভার যে মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে গিয়েছিল, এটি আমাদের দেশের উপর ভগবানের বিশেষ করুণার পরিচয়। এই যে সারা দেশের লোকের মনে জাতীয়তাবোধ

ও স্বাধীনতাস্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠেছে, ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে না এলে ইংরেজী ভাষা শিখে ইংরেজ জাতির মনীষীদের ভাবধারার সঙ্গে না পরিচিত হ'লে ঘটত না। কাজেই ইংরেজ-শাসন থেকে মুক্ত হ'লেও শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে যে প্রচুর দান আমরা পেয়েছি, তার ঋণ থেকে আমাদের মুক্তি ঘটবে না কোনদিন।

সাহেবের নজর পড়ল তাঁর ওপর। মেমসাহেবের বাংলা শেখবার শখ হ'ল। তাঁর ওপরে ভার দিলেন সাহেব। মাসে পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক দিতে চাইলেন। তিনি নিতে অস্বীকার করলেন। বললেন—তিনি যে এই কাজের ভার পেয়েছেন, তাতেই নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে বিবেচনা করছেন। মেমসাহেব যদি বাংলা ভাষা ভাল ক'রে শিখে ফেলতে পারেন, তা হ'লেই তাঁর পারিশ্রমিক পাওয়া হয়ে যাবে। এর পরই সাহেবের পদোন্নতি ঘটল। ওই প্রদেশের দেশীয় রাজ্যগুলির রাজাদের উপদেষ্টা হয়ে গেলেন। যাবার সময়ে তাঁর কথা ভুলবেন না—ব'লে গেলেন। ভোলেন নি। বৎসর খানেক পরে তাঁরই সুপারিশে ওই প্রদেশের একটি স্টেটের নাবালক রাজপুত্রের শিক্ষক ও অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হয়ে গেলেন তিনি। স্টেটটি নেহাত ছোট। রাজা বৎসর দুই হ'ল দেহরক্ষা করেছেন। বিধবা রাণী উপযুক্ত মন্ত্রীর সাহায্যে রাজ্য পরিচালনা

করছিলেন। ছেলেটির বয়স সাত বৎসর। তার বাবা বিশেষ পড়াশুনা করেন নি। তাতেও চুটিয়ে রাজ্য চালিয়েছিলেন। জবরদস্ত রাজা ছিলেন তিনি। প্রজারা তাঁর ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। রাজদৃষ্টি যার উপরে পড়ত, রাহুর দৃষ্টির মত সর্বনাশ ক'রে ছেড়ে দিত তার। গৃহস্থ সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারী হয়ে যেত। কন্যা, পুত্রবধূর উপরেও টান পড়ত মাঝে মাঝে। রাণী বাংলা দেশের মেয়ে। তাঁর বাবা বড় ব্যবসায়ী। দু পুরুষ ধ'রে কলকাতায় বাস। কাজেই রাণীজী অবাঙালী হ'লেও তাঁর চাল-চলনে হাব-ভাবে বাঙালীয়ানা ছিল যথেষ্ট। স্কুলে লেখাপড়া করেছিলেন কতকটা। রূপেরও অভাব ছিল না। তবু স্বামীকে সামলে রাখতে পারেন নি। স্বামীর পাশব অসংযম ও নিষ্ঠুর অত্যাচার চোখে দেখে ও কানে শুনে নীরবে মর্মবেদনা ভোগ করা ছাড়া তাঁর কিছুই করবার উপায় ছিল না। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেটি যাতে পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, ভাল রাজা না হতে পারলেও যাতে ভাল মানুষ হয়ে ওঠে—এই তাঁর হ'ল একমাত্র চিন্তা, একমাত্র বাসনা। অত্যাচারী মদ্যপ চরিত্রহীন স্বামীর কাছ থেকে অনেক দুঃখ ও মনস্তাপ তিনি পেয়েছিলেন। তাই তাঁর ভাবী পুত্রবধূকেও যাতে সেই রকম দুঃখ ও মনস্তাপ সহ্য করতে না হয়, তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন তিনি।

রাজ্য পরিচালনার ভার রাণীর হাতে ছিল, মাত্র কাগজে-কলমে। আসলে বৃদ্ধ মন্ত্রীই ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজ্য পরিচালনা তিনিই নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতে করতেন। প্রয়োজন হ'লে রাণীর পরামর্শ নিতেন। রাণীর তাতে আপত্তি ছিল না। মন্ত্রী রাজ-সরকারের প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্মচারী। প্রজাদেরও পরম বিশ্বাসভাজন। মন্ত্রীর দ্বারা তাঁর পুত্রের কোন অকল্যাণ হবে না—এ বিশ্বাস তাঁরও ছিল। মন্ত্রী কিন্তু এঁর নিয়োগ প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করেন নি। তবে তাঁদের উপরওয়ালা সাহেবের লোক ব'লে অসন্তোষ প্রকাশ করতেও সাহস করেন নি। হাসিমুখেই তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। খাওয়া-থাকার যথাসম্ভব সুব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। রাজবাড়ির এক প্রান্তে কয়েকটা ছোট ঘর ছিল। রাজবাড়ির কয়েকজন কর্মচারী সেখানে থাকত। তারই একটাতে থাকবার অনুমতি পেলেন। খাওয়ার ব্যবস্থাও ওইখানেই হ'ল। তাঁর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্যে মন্ত্রী মশায় কর্মচারীদের হুকুম দিলেন।

একটা ছবির উপরে দৃষ্টি পড়ল। তিনজন পাশাপাশি ব'সে। মাঝখানে তাঁর মুরুব্বি এজেণ্ট সাহেব। ডান পাশে মন্ত্রী। লম্বা-চওড়া দেহ। মুখে টাঙির মত পরিপুষ্ট গোঁফ, গাল পর্যন্ত লম্বা জুলফি, পরিধানে চোগা-চাপকান। মাথায় পাগড়ি—অনেকটা যাত্রাদলের মহাবীর দ্রোণের মত দেখাচ্ছে

তাঁকে। বাম পাশে ব'সে আছেন তিনি। এজেণ্ট সাহেব রাজ্য-পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। আসলে তিনি এসেছিলেন শিকার করতে। রাজ্যের সমস্ত পশ্চিমাংশ জুড়ে গভীর বিস্তৃত জঙ্গল। বাঘ, ভালুক, হাতী ইত্যাদি বহু জন্তু-জানোয়ারের আবাসস্থল। পরলোকগত রাজা বড় শিকারী ছিলেন। জঙ্গলের উপকণ্ঠে কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি বিস্তর আদিবাসীদের বাস। তারা রাজার শিকারের সহযাত্রী ছিল। সাহায্য করত শিকারে। বড় বড় উপরওয়ালা সাহেবেরা শিকারে এলেও তারা সাহায্য করত। অবশ্য এতে প্রচুর পুরস্কার পেত তারা। প্রদেশের লাটসাহেব প্রতি বৎসর শীতকালে শিকার করতে আসতেন। এজেণ্ট আসতেন প্রায়ই। তাঁর ওখানে যাবার মাস কয়েক পরেই এলেন। সেই উপলক্ষ্যে ছবি তোলা হ'ল। তিনিও পাশে স্থান পেলেন। সাহেবের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি যে মন্ত্রী মহাশয়েরও কত প্রীতিভাজন, তাই সাহেবকে দেখাবার জন্যে তাঁকেও পাশে স্থান দিয়েছিলেন মন্ত্রী মহাশয়।

রাজপুত্রকে পড়াবার জন্যে প্রতিদিন তাঁকে রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যে যেতে হ'ত। একটি বড় সুসজ্জিত কক্ষে পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল। একটি চাকর সর্বদা পাশে দাঁড়িয়ে থেকে রাজ-পুত্রের খবরদারি করত। গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে পাখা করত।

শীতকালে এমনই পাশে ব'সে থাকত। সকালে ঘণ্টা দুই ও রাত্রে ঘণ্টা দুই পড়াতে হ'ত। বিকালে একজন কুস্তিগীরের শিক্ষাধীনে কুস্তি করত রাজপুত্র। তাঁকেও সে সময়ে উপস্থিত থাকতে হ'ত। তার পর স্নান ক'রে পোশাক প'রে মোটরে বেড়াতে বেরোত। তাঁকেও সঙ্গে যেতে হ'ত। অর্থাৎ দিনে রাতে প্রায় ঘণ্টা ছয় রাজপুত্রের খবরদারি করতে হ'ত তাঁকে। ভালই লাগত তাঁর। বড়লোকের ছেলে—বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে; বংশের প্রদীপ, কাজেই রাজবাড়ির কর্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে দাসদাসী পর্যন্ত সকলের কাছ থেকে সর্বদা প্রচুর স্নেহবর্ষণ চলত তার ওপরে। তবু ছেলেটি বিগড়ে যায় নি। ভারি নম্র ও মিষ্ট স্বভাব ছিল তার। যা তাকে উপদেশ দিতেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনত, প্রাণপণে পালন করবার চেষ্টা করত। তা ছাড়া ছেলেটির মুখে এমন একটি সুকুমার লাবণ্য ছিল, যা স্বতই মনে স্নেহের উদ্রেক করত। কিছুদিনের মধ্যেই ছেলেটি তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিল।

রাণীজীকে অনেক দিন চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় নি তাঁর। একদিন রাত্রে শুধু কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন। পাঠকক্ষের সংলগ্ন আর একটা কক্ষ ছিল। রাজপুত্রের শয়ন-কক্ষ। মাঝখানে একটা দরজা। তাতে সর্বদা একটা খয়ের রঙের ভারী পর্দা ঝুলত। এরই পিছনে দাঁড়িয়ে রাণীজী তাঁর অধ্যাপনা শুনতেন।

তিনি প্রথমে কিছুই টের পান নি। হঠাৎ একদিন একটি নারীকণ্ঠের কোমল মিষ্ট ধ্বনি তীক্ষ্ণমুখ শরের মত হঠাৎ এসে অধ্যাপনার নিবিষ্টতাকে বিদ্ধ করল। চমকে উঠেছিলেন। চাকরটাকে ডাকছিলেন রাণীজী। সে ছুটে চ'লে গেল। রাজ-পুত্রের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনিও আর অধ্যাপনায় মন দিতে পারলেন না। সেদিন অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে নি। সেই কণ্ঠস্বর একটি ছোট পাখির মত তাঁর অন্তরের মধ্যে ব'সে ক্রমাগত পাখা ঝটকাতে লাগল।

কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীকে দেখবার সাধ জেগেছিল তাঁর মনে। কিছুদিন পরে সাধ মিটেছিল। খুব সম্ভব সেই বৎসর ভাদ্র মাসে। কদিন ধ'রেই শরীর খারাপ যাচ্ছিল। গোপাল-গঞ্জে যে ম্যালেরিয়া-বিষ দেহে প্রবেশ করেছিল, প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে তা একবার আত্মপ্রকাশ করত। এ বৎসর পাছে আক্রমণ ঘটে, সেই ভয়ে আগে থাকতেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তবু একদিন শরীরটা বিশেষভাবে খারাপ হয়ে উঠল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। উপবাস চালাতে লাগলেন দিন তুই ধ'রে। পড়ানো বন্ধ করেন নি কিন্তু। দিনে তুবার যথাসময়ে যেতেন। নির্দিষ্ট সময়টুকু পড়িয়ে চ'লে আসতেন। একদিন পড়ানো শেষ হয়েছে, ওঠবার উপক্রম করছেন, এমন সময়ে রাণীজী পর্দার আড়াল থেকে চাকরটাকে ডাক দিলেন।

চাকরটা ছুটল। সেদিনও সেই কণ্ঠধ্বনি তাঁর অন্তরকে আন্দোলিত করল। তিনি উঠতে পারলেন না। চাকরটা তখনই ফিরে এসে জানাল, রাণীজী তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছেন। গভীর বিস্ময়ে ও কৌতূহলে মন অভিভূত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে একজন দাসী কক্ষে প্রবেশ করল। হাতে রূপোর থালায় খাবার ও এক বাটি দুধ। তাঁর সামনে টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে দাসী বললে, রাণীমা আপনাকে খেতে বললেন। হঠাৎ এই অনুগ্রহবর্ষণে হকচকিয়ে গেলেন তিনি। চুপচাপ ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ। রাজপুত্র সবিনয়ে অনুরোধ জানাতেই হাত ধুয়ে খেতে শুরু করলেন।

মুখ নামিয়ে খেয়ে চলেছিলেন। চিন্তার জাল বোনা চলছিল মনে। হঠাৎ একটা শব্দে মুখ তুলে চাইতেই দেখলেন, রাজপুত্র উঠে দাঁড়িয়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মহিলা। রাজপুত্র বললে, মাতাজী। উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করতেই রাণীজী পরিষ্কার বাংলায় বললেন, উঠবেন না, খেয়ে নিন।

রাণীজীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শুনেছিলেন, তিনি অতিশয় রূপসী। কিন্তু এতটা রূপসী ব'লে ভাবেন নি কোনদিন। এ ধরনের রূপ তিনি আগে দেখেন নি কোনদিন। এর চেয়ে ফরসা রঙ দেখেছেন, এর চেয়ে ভাল গড়ন-পিটন দেখেছেন, কিন্তু সব মিলিয়ে এমন শান-দেওয়া তরবারির মত

উজ্জ্বল কঠিন ধারালো অথচ লীলায়িত রূপ কখনও তাঁর চোখে পড়ে নি। রাণীজীর বয়স তাঁর চেয়ে খুব কম ব'লে মনে হ'ল না। পরনে বিধবার বেশ। মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি মৃদুহাস্যমণ্ডিত।

রাণীজী বললেন, শুনলুম, আপনি কদিন কিছুই খাচ্ছেন না। কারণ কি?

তাঁর মত তুচ্ছ একটা লোকের সম্বন্ধে রাণীজী খবর রাখেন শুনে আশ্চর্য হলেন। কৃতজ্ঞতার ভারে মন ও মাথা নুয়ে পড়ল। জবাব দিলেন না।

অসুখ হয়েছে বুঝি?—রাণীজী জিজ্ঞেস করলেন।

এবার মাথা তুলে ওঁর মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, না।

রাণীজী বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললেন, তবে উপোস করছেন কেন?

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। চাকর হাত ধোবার জন্য পাত্র ও জল নিয়ে এল। হাত ধুলেন। চাকরের কাছ থেকে ধবধবে ফরসা তোয়ালে নিয়ে হাত-মুখ মুছলেন। তারপর বললেন, পাছে অসুখ হয় সেই ভয়ে উপোস করছি। ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে রাণীজী বললেন, অসুখ যদি হয়ই তো ভয় কিসের? এখানে ডাক্তার নেই নাকি ভাবছেন? তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, না না, সেজন্যে নয়। মানে, বিদেশে এসে—

রাণীজী বললেন, বিদেশে এসে অসুখে পড়লে আমরা বিদেশীরা আপনাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসব—এই আপনার ভয় তো? মুখ গম্ভীর, চোখ দুটি কিন্তু হাসতে লাগল রাণীজীর।

তিনি কিছু বলবার আগেই বলতে লাগলেন, বাঙালীদের ধারণা, দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসা, উচিত-অনুচিতবোধ শুধু তাদেরই আছে—আর কারও থাকতে নেই, তাই না? তিনি নতমুখে নিরুত্তর রইলেন। রাণীজী বললেন, আমিও তো একরকম বাঙালী। বাংলা দেশেই জন্মেছি, ওখানেই মানুষ হয়েছি। আমার বান্ধবীরা সবই প্রায় বাঙালীর মেয়ে—

মুখ তুলে চেয়েছিলেন। মুহূর্ত মাত্র চোখে চোখ মিলল। রাণীজী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, নমস্কার। ব'লেই চ'লে গেলেন।

এর পর প্রায় আসতেন রাণীজী। কোন কোন দিন ব'সে অধ্যাপনা শুনতেন। এতে আপত্তি করবার মত কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া অন্দরমহলে ছিল না। থাকলেও তাদের সাহস ছিল না। মন্ত্রী শুনলে হয়তো আপত্তি করতেন। কিন্তু অন্দর-মহলের কোন সংবাদ তাঁর কানে পোঁছে দেবার মত কোন লোক ছিল না। কারণ অন্দরমহলে রাণীজীরই একাধিপত্য ছিল। দাস-দাসী তিনি নিজের পছন্দমত রাখতেন। সকলেই তাঁর

অত্যন্ত অনুগত ছিল। অবাধ্য দাস-দাসী বা অবাঞ্ছিত আত্মীয়-আত্মীয়াকে অচিরে বিদায় নিতে হ'ত।

একদিন বললেন, আপনার পড়ানোর ধরন খুব ভাল। ক মাসেই খোকার খুব উন্নতি হয়েছে মনে হচ্ছে। আপনার হাতে থাকলে হয়তো মানুষ হয়ে উঠবে। একটু হেসে বললেন, আমারও আবার পড়াশুনা আরম্ভ করতে লোভ হয়।

সুমধুর সম্ভাবনার আশায় মন নেচে উঠল। কণ্ঠস্বরে বিন্দু-মাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে বললেন, তাই নাকি?

স্কুলে পড়তাম। খুব ইচ্ছা ছিল পড়তে। হঠাৎ সব বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল—

হঠাৎ বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তাঁর। এ গল্প পরে শুনেছিলেন। রাণীজীর বাবা খুব বড় কয়লা-ব্যবসায়ী। অনেকগুলো কলিয়ারির মালিক। কলিয়ারি করবার জন্যে কতকটা জায়গা রাজার কাছ থেকে কিনেছিলেন। রাজা তখন নেহাত যুবক। মন্ত্রীই সব করতেন। এই সূত্রে মন্ত্রীর সঙ্গে রাণীজীর বাবার সম্প্রীতি ঘটে। একবার কি একটা কাজে কলকাতা গিয়ে মন্ত্রী তাঁদের বাড়িতে উঠেছিলেন। রাণীজীর বয়স তখন বারো-তেরোর বেশি নয়। তাঁকে দেখে মন্ত্রীর খুব পছন্দ হয়। তাঁরই চেষ্টায় রাজরাণী হবার সৌভাগ্য ঘটেছিল তাঁর।

রাণীজীর পড়া শুরু হ'ল। পড়তেন রাত্রে। রাজপুত্রের

পড়া শেষ হবার পরে। পড়া শেষ হতে রাত্রি নটা বেজে যেত। এটা পাছে অন্যান্য কর্মচারীদের নজরে পড়ে, এই ভয়ে রাণীজী রাজপ্রাসাদের নীচের তলার একটা ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল রাণীজীর নিজের মহলের রান্নাঘরে। ঝি খাবার পৌঁছে দিয়ে যেত প্রতিদিন যথাসময়ে।

পড়া চলতে লাগল। অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রী। মাস দুইয়ের মধ্যেই যা উন্নতি দেখা গেল তাতে মনে হ'ল, এক বৎসর পড়লেই স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবার যোগ্য হয়ে উঠবেন। একদিন ব'লেও ছিলেন তিনি, পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে আছে নাকি? বলেন তো এখন থেকে চেষ্টা করি। রাণীজী মৃদু হেসে বলেছিলেন, পাগল! তা কি হয়!

পরিচয় ঘনিয়ে উঠতে লাগল ক্রমে। পড়ার পরে খেলা করতেন দুজনে। ক্যারাম, লুডো, গোলোকধাম। খেলার সময়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক দুজনেই ভুলে যেতেন কিছুক্ষণের জন্যে। লূতা-তন্তুর মত একটি সাময়িক স্বল্পায়ু বন্ধুত্বের ক্ষীণ সূত্র গ'ড়ে উঠত তাঁদের মধ্যে। খেলার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ঝগড়া করতে বাধত না দুজনে। বলা বাহুল্য, কোন খবর মন্ত্রী মশায় জানতেন না। সন্ধ্যার পরে রাণীর মহলে অতি-বিশ্বাসী দাসদাসী ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ

ছিল। তাঁর নূতন থাকার ব্যবস্থাটা শুধু মন্ত্রী মশায়ের কানে গিয়েছিল। তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। এটা রাজপুত্রের ইচ্ছা ব'লে আপত্তি খণ্ডন করেছিলেন রাণীজী। পুত্রকেও এই সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ দিয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে রাণীজী ও তাঁর মধ্যে একটি বন্ধুত্বের বন্ধন গ'ড়ে উঠল।

আর একটা ছবির উপরে দৃষ্টি পড়ল। রাণীজী, তিনি ও রাজপুত্র। রাজপুত্র মাঝখানে ব'সে। তাঁরা তুজন তু পাশে। কলকাতায় তোলা হয়েছিল। প্রতি বৎসর বড়দিনের ছুটিতে রাণীজী সপুত্র কলকাতায় পিতৃগৃহে যেতেন। মাস তুই থাকতেন বাবার কাছে। এবারও গেলেন। তাঁরও ওই মরসুমে মাস-খানেক ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল। রাণীদের সঙ্গে একই ট্রেনে কলকাতা গিয়েছিলেন। অবশ্য অন্য ছোট শ্রেণীর কামরায়। রাণীজী ও রাজপুত্রের জন্য নির্দিষ্ট কামরা ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন মন্ত্রী মশায়। একজন কর্মচারী তাঁকে লটবহর সমেত পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল। কাজেই রাণীজীর ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে নিজেদের কামরায় নিতে পারেন নি। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে রাণীজীর কাছে বিদায় নিতে গেলেন। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় উঠবেন মাস্টার সাহেব? তিনি কোন একটা মেসে উঠবেন জানালেন। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা

করলেন, কখন বাড়ি যাবেন ? তিনি বললেন, দিন দুই পরে। কলকাতায় মা ভাই বোনদের জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় কিনতে হবে। রাজপুত্র বললেন, আমাদের ওখানেই চলুন। ওখানে কোন অসুবিধা হবে না। রাণীজী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সর্বাঙ্গ দামী শাল দিয়ে ঢাকা। মাথায় অবগুণ্ঠন। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে জনস্রোত দেখছিলেন। চকিতে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে কালো বিদ্যুতের মত দৃষ্টি হেনে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রাজপুত্র যে কার পরামর্শে ও প্ররোচনায় তাঁকে সহগামী হতে অনুরোধ করেছে বুঝতে বাকি রইল না।

ওঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। অসুবিধা হওয়া দূরে থাক্, রাণীজী, তাঁর আত্মীয়স্বজন ও তাঁর বাবা এত আদর-আপ্যায়ন করতে লাগলেন যে, তাঁর লজ্জা হতে লাগল। রাণীজীর বাবাকে খুব ভাল লাগল তাঁর। এত ধনী, কিন্তু অত্যন্ত অমায়িক মানুষ। রাজপ্রাসাদের মত বিরাট বাড়ি। বড়লোকী জীবনযাত্রার উপকরণও প্রচুর। কলকাতায় নাকি আরও দু-চারখানা বাড়ি আছে। কলিয়ারি থেকে বৎসরে বহু লক্ষ টাকা আয়। রাণীজী ছাড়া আর কোন সন্তান নেই। বিপত্নীক হয়েছেন বহুদিন আগে। আর বিবাহ করেন নি। রাণীজীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। রাণীজী লুকিয়ে তাঁর কাছে পড়ছেন শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন।

দুদিন ছিলেন সেখানে। চ'লে আসবার আগে রাণীজী নিজের শোবার ঘরে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আপনাদের দেশে তো শুনেছি খুব ম্যালেরিয়া। একেবারে ম্যালেরিয়া ধরিয়ে ফিরবেন নাকি ?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, শীতকালে ম্যালেরিয়া থাকে না।

রাণীজী বললেন, তা হোক, আপনি বেশি দিন থাকবেন না। কিছুদিন থেকেই চ'লে আসবেন। বুঝলেন ? কণ্ঠস্বরে আদেশের চেয়ে প্রার্থনার সুরই বেশি বাজল।

বাড়ি যাবার আগেই রাণীজী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর হাতে একশো টাকার একটি নোট দিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিলেন, আপনার ভাই-বোনদের জন্যে আমার হয়ে কিছু উপহার কিনে নিয়ে যাবেন।

ফিরে এসেছিলেন মাসখানেক পরে। আসবামাত্র ডেকে পাঠালেন রাণীজী। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, অনেক দিন বাড়িতে কাটিয়ে দিয়ে এলেন—

সবিনয়ে নিবেদন করেছিলেন, আমার বোনের জন্যে পাত্রের সন্ধান করতে করতে দেরি হয়ে গেল। অনেক বড় হয়ে গেছে। মা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

রাণীজীর মুখের কঠিন ভাব উবে গেল এক মুহূর্তে। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, সন্ধান হ'ল ?

হয়েছে একটি।

কবে বিয়ে হবে?

টাকাকড়ির যোগাড় হ'লেই হবে।

কত টাকা?

চার হাজারের কম নয়।

কোথায় পাবেন এত টাকা?

কোন রকমে যোগাড় করতেই হবে।

রাণীজী আর কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনার বোন খুব সুন্দরী, নয়?

হ্যাঁ, তাই একটু সস্তায় পার হয়ে যাচ্ছে।

দিন দুই পরে হঠাৎ রাজপুত্রের জ্বর এল। রাণীজীর বাবা জরুরী কাজে কলিয়ারি গিয়েছিলেন। খুব ভয় পেলেন রাণীজী। বাবাকে টেলিগ্রাম করতে উদ্যত হলেন। তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন। অবিলম্বে ডাক্তার ডেকে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। নিজে রোগীর পাশে ব'সে দিবারাত্র সেবা করতে লাগলেন। রাণীজী রাত্রি জাগতে পারতেন না। পাশে ব'সে ঢুলতেন। তিনি জোর ক'রে তাঁকে শুতে পাঠিয়ে দিতেন।

তৃতীয় দিন রাত্রির শেষ দিকে জ্বর কমতে শুরু করল।

ভোর-রাত্রে জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে গেল। রোগী শান্তভাবে ঘুমোতে লাগল। তিনি অদূরে একটা ঈজি-চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ বুজে অনুভব করলেন, কে তাঁর মাথাটি অতি সন্তর্পণে তুলে বালিশের উপর রাখলে; শাল দিয়ে আকণ্ঠ তাঁর দেহ ঢেকে দিলে। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখলেন, রাণীজী পুত্রের শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। পুত্রের কপালে বুকে হাত দিয়ে দেহের তাপ পরীক্ষা করবার চেষ্টা করলেন। পরীক্ষার ফলে বিশ্বাস হ'ল না সম্ভবত। পাশে ব'সে পুত্রের গালের উপর নিজের গালটি রাখলেন অনেকক্ষণ। জ্বর সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গেছে বুঝতে পেরে তাঁর মুখ মেঘ-নির্মুক্ত হ'ল। গভীর স্নেহে পুত্রের কপোলে চুম্বন করলেন। নেমে এলেন পালঙ্ক থেকে। তাঁর কাছে এসে কিছুক্ষণ থামলেন, তার পর ধীরপদে চ'লে গেলেন।

পরদিন সকালে রাণীর কাকার বাড়ি থেকে জন কয়েক আত্মীয়া এসে সারাদিন থাকলেন। তিনি চাকরের মারফত রাজ-পুত্রের খবর নিয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর আত্মীয়াদের বিদায় দিয়ে রাণী তাঁর ঘরে এসে হাজির হলেন। তিনি একটা চেয়ারে ব'সে কি একটা বই পড়ছিলেন। সবিস্ময়ে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। রাণীজী বললেন, ব্যস্ত হবেন না, বসুন।—ব'লে এগিয়ে এসে তাঁর বিছানার উপরে ব'সে পড়বার উপক্রম করলেন।

সত্যি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সামান্য শয্যা। পাতলা তোষকের ওপর সুতোর সস্তা চাদর পাতা। তাতে রাজরাণীকে বসতে দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ।

তাড়াতাড়ি চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে রাণীজীকে বসতে অনুরোধ করলেন। রাণীজী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আপনার বিছানায় কাউকে বসতে দিতে চান না বুঝি ?

অপ্রতিভভাবে বললেন, না না, তা নয়, মানে—

রাণীজী বাধা দিয়ে বললেন, খোকার জন্যে এ ক'দিন যা করেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য। কিন্তু একমাত্র ছেলের মা হয়ে কৃতজ্ঞতা না জানিয়েও পারছি না। আপনার এ উপকার কোনদিন ভুলব না—

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, রাজপুত্র আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। যা করেছি স্নেহের তাগিদে করেছি। ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা পাবার আশায় করি নি। অবশ্য বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে কিছু প্রশংসা বা পুরস্কার আপনার কাছে প্রাপ্য বটে।

ঝটিতি রাণী উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে তাঁর হাত দুটি ধ'রে গভীর অনুশোচনার স্বরে বললেন, ছিঃ ছিঃ, আমি ও-কথা বলি নি! আপনাকে কর্মচারী ব'লে ভাবি না আমি। বন্ধু ব'লে, আত্মীয় ব'লে ভাবি। ভাইয়ের মত আপনাকে বিশ্বাস করি। কিছু মনে করবেন না আপনি। মাপ করুন আমাকে—।

আরও কত কি একটানা ব'লে গেলেন ; কিন্তু কানে কিছুই গেল না। রাণীজীর শতদলের মত শুভ্র কোমল হাত দুটির স্পর্শে তাঁর দেহের শিরায় ও ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ বইতে শুরু করল, পূর্ণেন্দু-করস্পর্শে সাগরের মত হৃদয়ের রক্ত উদ্বেল হয়ে উঠল, কানের মধ্যে ঝমাঝম করতাল বাজতে লাগল, সর্বদেহ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।'

রাণীজী কিছুই লক্ষ্য করলেন না। বক্তব্য শেষ ক'রেই দ্রুতবেগে চ'লে গেলেন।

পরদিন সকালে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তরপাড়ায় একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন তারই খোঁজে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। ঘুমও এসেছিল একটু। মেয়েলী গলায়, 'জগদীশবাবু' ডাক শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন, রাণীজী শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে বিস্ময়াহত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, আপনি!

রাণীজী বললেন, শরীর খারাপ তো শোন না। আমি বসছি।—ব'লে চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

তিনি বললেন, শরীর খারাপ নয়। এমনই কাজ নেই ব'লে শুয়েছিলাম।

রাণীজী বললেন, আর একবার খোঁজ করেছিলাম আপনার। শুনলাম, সকালেই বার হয়ে গিয়েছিলেন—

হ্যাঁ, একটি ছেলের খবর পেয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম তাকে।

দেখলেন ? কেমন ?

—ভাল। ছেলেটি ডাক্তারি পড়ে। দেখতেও ভাল। আমার বোনের সঙ্গে বেশ মানাবে। তবে অনেক টাকা চায়—

টেবিলে খানকয়েক বই ছিল। একটা বই তুলে নিয়ে রাণীজী বললেন, বাংলা বই। কার লেখা ?

রবীন্দ্রনাথের।

ভারি পড়তে ইচ্ছা করে ওঁর বই। চেষ্টাও করেছি কিছু কিছু পড়তে। ভাল বুঝতে পারি না। বাংলা আমাকে ভাল ক'রে শিখিয়ে দিন না।

বেশ তো।

রবীন্দ্রনাথের কোন গান জানেন ?

জানি কিছু কিছু।

আমার ভারি শিখতে ইচ্ছে করে। আমি বাঙালীদের মেয়েস্কুলে পড়েছিলাম কিছুদিন। রবীন্দ্রনাথের গান শেখাত। শিখেছিলাম দু-একটা। ভুলে গেছি এখন। বাবাকে বলেছিলাম একজন ওস্তাদ রাখতে। বাবা গান পছন্দ করেন না। আর উনি তো গান শুনলে চ'টে উঠতেন। একটু চুপ ক'রে থেকে একটু লজ্জিত হাসি হেসে বললেন, কাল কি কাণ্ড

ক'রে বসলাম! সারাদিন মনটা ভাল ছিল না। তার ওপরে আপনিও সোজা কথাটা না বুঝে বাঁকা ভাবে নিলেন—

রাণীজী তাঁর কথায় দুঃখ পেয়েছেন জেনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

রাজপুত্র ক্রমে সেরে উঠতে লাগল। পড়াশুনা বন্ধ। রাণীজীর তো কলকাতা আসার পর থেকেই বন্ধ ছিল। রাণীজী কিন্তু তাঁর বাবা যতদিন ফেরেন নি, তাঁর ঘরে সন্ধ্যার পর আসতেন। গল্প করতেন আত্মীয়স্বজনদের কথা। বলতেন—কাকার বাড়ির সবাই আমাদের খুবই ঈর্ষা করে। আমার ও খোকার ওপরে খুব রাগ ওদের। আমরা না থাকলে বাবার সব কিছু তো ওরাই পেত। এই জন্যে খোকার অসুখে ওদের খবর দিই নি। ওদের বিশ্বাস করি না আমি। এরই জন্যে ওরা সেদিন এসে কথা শুনিয়ে গেল। তাই আপনার ঘরে বিশ্রী কাণ্ড ক'রে বসলাম।

কোনদিন স্বামীর কথা বলতেন, শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। বিশ-ত্রিশ জন লোককে একা হটিয়ে দিতে পারতেন। ওঁর ছবি দেখেছেন তো! একটা পুরুষের মত চেহারা। কত বড় বুকের ছাতি দেখেছেন! আমার ওপর রাগ হ'লে আমাকে দু পায়ের গোছ ধ'রে তুলে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবার ভয় দেখাতেন। অবশ্য নতুন শ্বশুর-বাড়ি যাবার পরে। তখন

তেরো-চোদ্দ বছর বয়স। খুব পাতলা ছিলাম। পরে একটু হেসে বললেন, লম্বা-চওড়ায় যখন বেড়ে উঠলাম, তখন ওসব চলত না।

একদিন তাঁর টেবিলে একজোড়া ডাম্বেল দেখে বললেন, আপনি ব্যায়াম করেন নাকি? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ছাত্রাবস্থায় নিয়মিত করতাম। আমাদের কলেজে একজন ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। তিনি যত্ন ক'রে শিখিয়েছিলেন। আজকাল এমনই নিয়মরক্ষা করি আর কি!

শুনে বললেন, আপনার শরীর দেখে মনে হয় বটে। উনি নিয়মিত কুস্তি করতেন। কুস্তি করবার জন্যে আমার ওপরেও জবরদস্তি করতেন। আমি কোন রকমে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম। তা এমন লুকিয়ে করবার দরকার কি? খোকার সঙ্গে নিয়মিত করলেই পারেন। তাতে খোকারও উৎসাহ বাড়বে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, পুরুষের যদি পৌরুষ না থাকে, তার ওপরে যদি নির্ভর করতে না পারা যায়, তো সে পুরুষের মূল্য কি?

রাজপুত্র সম্পূর্ণ সেরে ওঠবার পরে একটা ছবি তোলা হ'ল। রাজপুত্র, তিনি ও রাণীজী। হঠাৎ রাজপুত্র আবদার ধরলেন—তাঁর ও রাণীজীর একসঙ্গে একটা ছবি তোলা হোক। তাই হ'ল।

পাশাপাশি ছবি দুটির উপরে অনেকক্ষণ দৃষ্টি ন্যস্ত ক'রে রাখলেন জগদীশপ্রসাদ।

নীচের সারিতে পাশাপাশি কয়েকটি ছবি। একটিতে স্মিথ সাহেব ও তিনি। আর একটিতে স্মিথ সাহেব, রাজপুত্র ও তিনি। আর একটিতে রাজপুত্র ও রাণীজী। একই দিনে তোলা ছবিগুলি। চোখ পড়বামাত্র সব ঘটনা মনে পড়ল।

কলকাতা থেকে ফেরবার পর মন্ত্রী মশায় একদিন ডেকে পাঠিয়ে বললেন, সাহেবের সঙ্গে চিঠি লেখা চলে নাকি?

চলত না। তবু বললেন, চলে বইকি! ভারি স্নেহ করেন তো আমাকে। বিশেষ ক'রে মেমসাহেব—

কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চিন্তা ক'রে মন্ত্রী বললেন, আপনি রাজপ্রাসাদে আছেন ব'লে কর্মচারীদের মধ্যে আপত্তি উঠেছে। বউরাণী তো ছেলেমানুষ। কিছু বোঝেন না। খোকা-রাজা আবদার ধরেছে ব'লেই আপনাকে ওখানে থাকতে দেওয়াটা ভাল কাজ হয় নি। আপনি অবিলম্বে কর্মচারীদের ওখানে গিয়ে থাকুন। আর তাতে যদি অসুবিধে বোধ করেন তো কাছারি-বাড়িতে একটা ঘর খালি আছে, সেখানে গিয়ে উঠুন।

যে আজ্ঞে।—ব'লে তিনি চ'লে এসে রাণীকে সব বললেন। শুনে রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল তাঁর। বললেন, আপনি কোথাও যাবেন না। যা বলতে হয় আমি ব'লে দেব এখন।

এরই কিছুদিন পরে স্মিথ সাহেব এলেন। প্রজাদের পক্ষ থেকে তাঁকে যথোচিত সংবর্ধনার ব্যবস্থা করলেন মন্ত্রী মশায়। রাজার পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করলেন রাণী নিজে। রাজা যতদিন জীবিত ছিলেন, বরাবর নিজের প্রাসাদে এজেন্ট সাহেবদের নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁদের আপ্যায়ন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর অনেক দিন হয় নি। এবার নূতন ক'রে আবার শুরু হওয়াতে মন্ত্রী মশায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রাণীর কাছ থেকে এতটা স্বতন্ত্রতা তিনি আশা করেন নি।

সংবর্ধনার ভার সম্পূর্ণ তাঁর উপরে পড়ল। এ ব্যাপারটি নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করবার জন্যে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করতে লাগলেন। শহর থেকে খাদ্য পানীয় ফলমূল আনলেন নিজে গিয়ে। শহরের শ্রেষ্ঠ বাবুর্চি আনিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করলেন। ছবি তোলার জন্যে ফোটোগ্রাফারও আনিয়েছিলেন শহর থেকে।

রাজপ্রাসাদের নীচতলায় একটা হলঘরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর রাণী পর্দার আড়ালে থেকে আর্জি পেশ করলেন, মন্ত্রী মশায় বৃদ্ধ হয়েছেন। আমি এখন থেকে একজন যোগ্য লোককে কাজের জন্যে তৈরি ক'রে নিতে চাই। মাস্টার সাহেব খুবই সাধু ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। ভবিষ্যতে ওঁর মত লোকের হাতে যদি রাজ্যের শাসনভার পড়ে

তো আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। রাজপুত্রেরও তাই ইচ্ছা। আপনি মন্ত্রী মশায়কে ব'লে এর ব্যবস্থা করুন।

সাহেব সানন্দে সম্মতি দিলেন। বিদায়ের পূর্বে রাণীর অনুগ্রহভাজন হতে পারার জন্য তাঁর প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। এও জানালেন যে, তাঁর উন্নতির জন্যে তিনি যা প্রয়োজন হবে করতে দ্বিধা করবেন না।

রাণী ও রাজপুত্রের ছবি তোলা হ'ল সাহেব বিদায় হওয়ার পরে।

আর একটা পৃষ্ঠা ওল্টালেন জগদীশপ্রসাদ। অনেকগুলি ছবি পাশাপাশি আঁটা রয়েছে। একই দিনে তোলা ছবি। রাণীর একলা ছবি। তাঁর ও রাজপুত্রের একা একা ছবি। একটা ছবিতে তিনি ও রাণী। একটি বৃদ্ধার ছবি। চিনলেন, রাণীর অতি বিশ্বাসভাজন পুরাতন ঝি রুক্মিণী। পাহাড়ের ছবি। পাহাড়ের নানা দৃশ্যের ছবি। দেবমন্দিরের ছবি। তিনি ও রাজপুত্র তুলেছিলেন। মৃত রাজার খুব ভাল ক্যামেরা ছিল। তাঁর এ বিদ্যা জানা আছে শুনে রাণীজী তাঁকে ক্যামেরাটি ব্যবহার করবার হুকুম দিয়েছিলেন। রাজপুত্রকেও ছবি-তোলা শিখিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। রাজপুত্র কিছু দিনেই খুব ভাল ছবি তুলতে শিখে ফেলেছিল।

রাণীর ছবিটিতে দৃষ্টি ন্যস্ত করলেন। পরনে গরদের শাড়ি।

গায়ে ব্লাউজ নেই মনে হ'ল। মাথার চুল বিশৃঙ্খল, পারিপাট্য-হীন। মুখে পরম তৃপ্তির পবিত্র হাসি। চোখে গভীর ক্লান্তি। দাঁড়িয়ে আছেন। উদ্ধৃত ডান হাতের প্রসারিত করতলের উপর একটি কারুকার্যমণ্ডিত থালায় দেবতার প্রসাদী ফুল ও মিষ্টান্ন।

রাজধানী থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে একটা পাহাড়। পাহাড়ের উপর মহাবীরের মন্দির। পুত্রের কল্যাণ-কামনায় মহাবীরের পূজা দিতে গিয়েছিলেন রাণী। সঙ্গে গিয়েছিলেন রাজপুত্র ও তিনি। বুড়ি ঝি রুক্মিণীও সঙ্গে গিয়েছিল। পাহাড়ের উপরে শুধু তিনি ও রাণী উঠেছিলেন। সারাদিন উপবাস, তবু সোৎসাহে উঠতে লাগলেন। খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবু মুখের হাসিটুকু বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন একবার, খুব কষ্ট হচ্ছে, নয়? রাণী মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলেন। চোখ দুটিতে নবজাত সন্তানের প্রতি পশু-মাতার অবোধ অপার স্নেহ উথলে উঠল। মৃদু হেসে বললেন, এ কষ্ট তো তুচ্ছ জগদীশবাবু! খোকার মঙ্গলের জন্যে যদি দেহের এক-একটি অঙ্গ কেটে দিতে হয় তো এমনই হাসি মুখেই দেব।

পুরোহিত অপেক্ষা করছিলেন রাণীজীর জন্যে। আগে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সসম্মানে রাণীকে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। পূজোর পরেই ছবি তুলেছিলেন তিনি।

আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে পাহাড় থেকে নেমেছিলেন। মন্দিরের চাতালের এক পাশে পাশাপাশি ব'সে তুজনে গল্প করেছিলেন কিছুক্ষণ। তাঁর খোকার কথা খালি। তাকে ঘিরে আজ দশ বৎসর ধ'রে অবিরাম তিল তিল ক'রে যে স্বপ্নসৌধ রচনা ক'রে তুলেছেন, তারই গল্প করলেন রাণীজী। মাতৃস্নেহ-মণ্ডিত মুখখানিতে স্বর্গের আভা স্থির হয়ে রইল। চোখে অশ্রুর কুয়াশা ঘনিয়ে উঠতে লাগল মাঝে মাঝে। এই প্রসঙ্গে স্বামীর কথা এসে পড়ল। বললেন, যে ভাবে দিন দিন নেমে যাচ্ছিলেন, এতদিন বেঁচে থাকলে কোথায় তলিয়ে যেতেন পাত্তা পাওয়া যেত না। খুব ভাল ছিলেন আগে। একটু চুপ ক'রে কি চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ।

কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে রাণীর ব্যবহারে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক একেবারে ম'রে-ঝ'রে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে একটি প্রীতির বন্ধন সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মত ফুটে উঠছিল, তারই সুরভি তাঁর সম্পর্কে রাণীর কথায় কাজে ও আচরণে সর্বদা প্রকটিত হ'ত। মাঝে মাঝে গল্প করতেন তাঁর সঙ্গে। ঝি-চাকরদের কাছে সংকোচ করতেন না। তাঁর জীবনের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন। নিজের জীবনের নানা কথা বলতেন। অতি গোপনীয় কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না।

রাণী বলতে লাগলেন, একটা সাহেব বন্ধু ছিল। শিকার করত ওঁর সঙ্গে। তার কাছ থেকেই মদ খেতে শিখলেন। মদ খেলে আর মানুষ থাকতেন না। পশু হয়ে যেতেন। পশুর মতই হিংস্র, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। প্রজাদের মেয়ে-বউ ধ'রে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করতেন। তাঁর চোখের সামনে এসব অকাজ করতেও দ্বিধা করতেন না। প্রজারা আপত্তি করলে তাদের মারধোর করতেন, ঘর জ্বালিয়ে দিতেন। আপত্তি করেছিলাম ব'লে আমাকেই মেরেছিলেন একদিন। এসব দেখে মন ধীরে ধীরে বিষিয়ে উঠছিল আমার। আত্মহত্যা করব স্থির করেছিলাম। করতামও। হঠাৎ খোকা এসে গেল। আর মরতে পারলাম না। মন খারাপ হ'লেই ওকে বুকে চেপে ধরতাম। বুকে বল পেতাম, বাঁচবার শক্তি পেতাম।

আরও কত গল্প করলেন। হঠাৎ ব'লে উঠলেন, আপনার হাতে খোকাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। ওকে মানুষের মত মানুষ ক'রে তুলুন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, আমিও চুপ ক'রে ব'সে থাকব না। আপনার ভবিষ্যৎ এমন গ'ড়ে দিয়ে যাব যে, আমাকে ভুলতে পারবেন না কোনদিন।

মনের কোণে কোণে প্রতিধ্বনিত হ'ল ওই কথাটি—আমাকে কোনদিন ভুলতে পারবেন না। ভুলতে পেরেছেন কি? চেয়ারে হেলে শুলেন জগদীশপ্রসাদ। রাণীর মুখখানি

মনের পটে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করলেন। প্রথমে আভাস মাত্র ফুটল, তার পর ধীরে ধীরে মুখখানি স্পষ্ট ফুটে উঠল—ঝলমল করতে লাগল তাঁর সারা চিত্ত-পট জুড়ে। রাণীকে ভোলেন নি তিনি। অন্তরের মধ্যে এখনও অটুট হয়ে আছেন। এখনও কল্যাণ কামনা করছেন তাঁর। অতসীও হারায় নি তাঁর মন থেকে। অন্তরের একান্তে মিলন-প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

পাহাড় থেকে নামবার সময়ে রাণী বললেন, বন্দুক চালাতে জানেন? তিনি 'না' বলেছিলেন। রাণীজী বললেন, শিখে রাখা ভাল। কাউকে হত্যা করবার জন্যে নয়, আত্মরক্ষার জন্যে।

আর একটা ছবির উপরে দৃষ্টি পড়ল। অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তাঁর ও রাণীর ছবি। তিনি পরেছেন ধুতি ও পাঞ্জাবি। রাণীর পরনে সধবা মেয়ের মত জমকালো শাড়ি—নানা অঙ্গে নানা অলঙ্কার। কৌতুকের হাসিতে চোখ দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত। মুখে অপরূপ সৌন্দর্য।

আর রাণী নয়, রাণী হৈমবতীও নয়—শুধু হৈমবতী। রাণীর নাম জানতেন না তিনি। রাণী তাঁকে নাম ধ'রে ডাকতেন। তিনি এমন ভাবে কথাবার্তা চালাতেন যে, নাম ধ'রে ডাকবার প্রয়োজন হ'ত না। একদিন রাণী বললেন, আমি কতদিন কতবার আপনার নাম ধ'রে ডেকেছি। আপনি তো কখনও আমার নাম ধ'রে ডাকেন নি? এবার প্রয়োজন হ'লে আমাকে

নাম ধ'রে ডাকবেন, বুঝলেন? রাণীর নাম জানেন না স্বীকার করতে হ'ল তাঁকে। বিস্মিত হলেন শুনে। সক্ষোভে বললেন, এতদিন কাছে কাছে রয়েছেন, আমার নামটা জানবার কৌতূহল হয় নি?

তিনি বললেন, আসল মানুষটিকে জানতে পেরেছি। নাম জানবার দরকার কি?

ঝাঁজিয়ে উঠলেন রাণী, ওসব কথা বাদ দিন। অত্যন্ত পর ব'লে ভাবেন আমাকে। নাম জানিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাম ধ'রে ডাকবেন। যদি ভুল হয় তো জরিমানা দেবেন।

সেবারও বড়দিনে কলকাতা যাওয়া হ'ল। এবার আর কোন কর্মচারী সঙ্গে গেল না। তাঁরই হেফাজতে গেলেন— হৈমবতী, রাজপুত্র ও বুড়ি ঝি রুক্মিণী। একই কামরায় গেলেন সবাই। রাত্রে হৈমবতী ঘুমোলেন না। তাঁকেও ঘুমোতে দিলেন না। গল্প করতে লাগলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বিয়ে করেন নি কেন? তিনি জবাব দিলেন, এতবড় অবিবাহিতা বোন ঘাড়ের ওপরে চেপে রয়েছে—। সবিস্ময়ে রাণী বললেন, এখনও বিয়ে হয় নি, না?

না, টাকার যোগাড় হয় নি—

আমাকে বলেন নি কেন? আমি দিতাম। আপনাদের স্টেটের টাকা নয়। আমার নিজের টাকা। বাবা কলিয়ারির

আয় থেকে আমার হাত-খরচ হিসেবে মাসে হাজার টাকা ক'রে ব্যাঙ্কে জমা দেন। অনেক দিন কিছু খরচ করি নি, অনেক টাকা জ'মে গেছে। সঙ্কোভে বললেন, কিছুতেই আপনার মনে করতে পারছেন না আমাকে! মৃদু হেসে বললেন, অবাঙালী ব'লেই বোধ হয়। নয়? বাঙালী ক'রে নিন না! কিছুক্ষণ পরে বললেন, একটা গান করুন। রবীন্দ্রনাথের।

গান গেয়েছিলেন, 'এমন দিনে তারে বলা যায়'। শীতের নির্মেঘ নীলাকাশ। আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ। ঠিক পাশেই ব'সে হৈমবতী। সর্বাঙ্গ শাল দিয়ে ঢাকা। মাথা খোলা। জানলার বাইরের দিকে মুখ ক'রে ব'সে। হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস এসে মুখে লাগছে, মাথার বিশৃঙ্খল চুলগুলি উড়ছে। চোখ বুজে সমাহিত মনে গান শুনছেন হৈমবতী। চাঁদের আলোয় ওঁর শুভ্র সুন্দর নিটোল মুখখানি মর্মর-প্রতিমার মুখের মত দেখাচ্ছে।

গান শেষ হ'ল—যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে, সে কথা আজি যেন বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়'—

হৈমবতী নিস্পন্দ ব'সে রইলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ কানে এল।

সেবারও যাবার আগে হৈমবতী বার বার বললেন, বাড়িতে গিয়ে ব'সে থাকবেন না যেন।

কথা রাখতে পারেন নি। ফিরতে দেরী হয়ে গেল। হৈমবতী ডেকে পাঠালেন। মুখে কঠোর গাম্ভীর্য। ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন, এত দেরি করলেন যে। নিষেধ করলাম না বার বার!

এত সাধে গড়া প্রীতির বন্ধন টুকরো টুকরো হয়ে গেল! বন্ধুত্বের মুখোশ খ'সে গিয়ে প্রভুর রক্তচক্ষু প্রকট হয়ে উঠল! সবিনয়ে নিবেদন করলেন, বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হ'ল। মা ছাড়লেন না।

ঠিক হ'ল?

হ্যাঁ।

কত দিতে হবে?

কিছু না। আমাদের গ্রামের জমিদারের ছেলে। জমি-দারের এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলেটির সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে। বদলে মেয়েটিকে আমাকে বিয়ে করতে হবে।

হৈমবতীর মুখের ওপর একটা কালো ছায়া নামল নাকি! কুঞ্চিত চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল বুঝি! জগদীশপ্রসাদ ব'লে ফেললেন, আমার আর এক মাস ছুটি দরকার হবে। বিস্ময়া-হত কণ্ঠে হৈমবতী বললেন, আরও এক মাস ছুটি! তা হয় না জগদীশবাবু। খোকার পড়াশোনার খুব ক্ষতি হবে।

যা ক্ষতি হবে ফিরে এসে যথাসাধ্য চেষ্টায় পূরণ ক'রে দেব।

কুটিল হাসিতে ওষ্ঠাধর বাঁকা হয়ে উঠল রাণীর। শ্লেষের স্বরে বললেন, ক্ষতি একবার হয়ে গেলে তা পূরণ করা যায় ব'লে আপনার ধারণা? গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, বেশ, আপনি মন্ত্রী মশায়ের কাছে দরখাস্ত করুন।

আপনাকে সুপারিশ ক'রে দিতে হবে।

প্রবল ঘাড় নেড়ে তীব্র কণ্ঠে হৈমবতী ব'লে উঠলেন, আমি কিছু করতে পারব না। আমার কাছে আর কিছু আশা করবেন না।

রাণীর ব্যবহারে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন মনে। অপমানিত বোধ করেছিলেন। ভাবে-ভঙ্গীতে বিন্দুমাত্র প্রকাশ না ক'রে নীরবে নেমে এসেছিলেন। সেই দিন বিকালে রাণী কোথায় বার হয়েছিলেন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

রাত্রে রাজপুত্রকে পড়িয়ে ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই সব কথা ভাবছিলেন। বন্ধুত্ব, প্রীতি, হয়তো—প্রেম! রাণীকে ঘিরে কামনার বিচিত্র বর্ণে আঁকা কত কল্পনার ছবি! কত স্বপ্ন দেখা! রামধনুর মত ক্ষণিকের মায়া। মাটির তুচ্ছ কীটের সঙ্গে আকাশের তারার বন্ধুত্ব! নিজের মূঢ়তায়, স্পর্ধায়

হাসি পেল। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ! সামান্য একটা ক্রটির আঘাত সহ্য করতে পারল না! স্থির করলেন, চাকরি ছেড়ে দেবেন। তখনই নয়। ওদের সঙ্গে যাবেন। কিছুদিন পরে একটা অজুহাত দেখিয়ে চাকরি ছেড়ে দেবেন। আত্ম-সম্মানের বিনিময়ে অর্থ পদগৌরব কিছুরই প্রয়োজন নেই তাঁর। বড়লোকের খামখেয়ালী মেজাজের দাসত্ব করা তাঁর আর পোষাবে না। কোন একটা কলেজে অধ্যাপকের, অভাবে কোন একটা স্কুলে মাস্টারি যোগাড় ক'রে নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেবেন।

রাত্রি ন'টার সময়ে রাণী ডেকে পাঠালেন। যেতেই বললেন, আপনি কবে যেতে চান? তিনি জানালেন, পরদিন সকালেই তাঁর যাবার ইচ্ছা। রাণী বললেন, আপনাকে ছুটি দিলাম। আপনাকে কিছু লিখতে হবে না মন্ত্রী মশায়কে, যা লেখবার আমি লিখব।

রাণীর তুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর মুখের উপরে স্থির হয়ে রইল। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। রাণী নীরস স্বরে কিঞ্চিৎ অনুশোচনার আমেজ মিশিয়ে বললেন, ও-বেলায় মনটা ভাল ছিল না। ব্যবহারে কোন ক্রটি হয়ে থাকলে মাপ করবেন।

না না, মাপ আবার কি!—ব'লে তিনি নমস্কার ক'রে

বিদায় নিলেন। ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই রাণীজী ডাকলেন, জগদীশবাবু! শুনুন।

কাছে যেতেই বললেন, আমার কাছে আপনারও মাপ চাওয়া উচিত।

বিস্ময়ের স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন?

আপনি আমার অপমান করেছেন।

চমকে উঠলেন তিনি।—অপমান করেছি আপনাকে?

ম্লান হেসে রাণী বললেন, করেছেন বইকি। আমাদের বন্ধুত্বের অপমান করেছেন। আপনার জীবনের এতবড় একটা ব্যাপারে মত দেবার আগে আমাকে একটা কথা জানাবারও দরকার মনে করলেন না?

তিনি বললেন, কিন্তু আমি তো মত দিই নি এখনও।

রাণী বললেন, তবে যে ও-বেলায় বললেন?

তিনি বলেছিলেন, মা আমার বোনের বিয়ে দেবার জন্যে যে রকম ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন—টাকার যোগাড় না হ'লে আমাকে শেষ পর্যন্ত মত দিতেই হবে। তবে আপনাকে না জানিয়ে মত দিতাম না।

মুহূর্তের মধ্যে রাণীর মুখের ভাব কোমল হয়ে উঠল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি বলছেন?

আমাকে বিশ্বাস করুন।—তিনি বললেন।

বাড়ি ফিরে গিয়ে তিনি বদল-বিয়ে বন্ধ ক'রে শুধু বোনের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। জমিদারবাবুকে বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। তবে দক্ষিণার অঙ্ক দশ হাজার টাকার এক পাই কম হবে না। জানালেন।

দিন দশ পরে একদিন বিকেলে তাঁর ছোট ভাই ছুটে এসে বললে, দাদা, একজন ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন।

বেরিয়ে গিয়ে আগন্তুককে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হৈমবতীর বাবার নিজস্ব ড্রাইভার চাটুজ্জে মশায়। অনেক দিনের পুরনো লোক। হৈমবতীর জন্মের আগে থেকে ওঁদের সংসারে আছেন। বয়স পঞ্চাশের উপরে। প্রায় সমস্ত মাথাটা জুড়ে টাক। মুখে ভালমানুষী হাসি। বোকা-সোকা ভাল মানুষ। তাঁকে দেখে একগাল হেসে বললেন, বেশ লোক মশায়! বাড়িতে ব'সে আছেন তোফা আরাম ক'রে, ওদিকে আপনাদের রাজ্যির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। মন্ত্রী মশায় আপনার কাছে কি একটা খবর জানতে চিঠি লিখেছেন রাণী-দি'মণিকে। তাই ছুটে আসতে হ'ল তাঁকে।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, বলেন কি? কোথায়?

রাস্তায়, মোটরে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তাঁদের গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়েছে, রাণী

এ খবর আগে নিয়েছিলেন। হঠাৎ যে কোন অছিলায়—কোনদিন তাঁদের গ্রামে চ'লে আসতে পারেন, এ চিন্তা তাঁর স্পর্ধিততম কল্পনারও বাইরে ছিল। অনতিবিলম্বে রাণীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। চাটুজ্জে মশায় বলতে লাগলেন, কর্তা মশায় তো বাড়িতে নেই। বিশেষ কাজে দিল্লী গেছেন। খোকা-রাজাও সঙ্গে গেছেন। দিদিমণি একা বাড়িতে। বললাম, এখনই মোটরে তুলে নিয়ে আসছি মাস্টার মশায়কে, শুনলেন না।

গিয়ে দেখলেন, গাড়িতে ব'সে রয়েছেন হৈমবতী। পাশে রুক্মিণী। তাঁকে দেখেই রুক্মিণী নেমে চ'লে গেল।

রাণীজীর মুখ থমথম করছিল। তাঁকে দেখেই টকটকে লাল হয়ে উঠল। মৃদুকণ্ঠে বললেন, ভেতরে আসুন। ভিতরে গিয়ে পাশে ব'সে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। সামনে তাকিয়ে দেখলেন, রুক্মিণী ও চাটুজ্জে মশায় অনেক দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

গভীর ঔৎসুক্যে ও পরম বিস্ময়ের সঙ্গে রাণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কৌতুকময়ীর আবার এ কি কৌতুক? সেদিন নিষ্ঠুর আঘাতে যে ক্ষত করেছেন, তাতে প্রলেপ লাগাতে এসেছেন বুঝি?

রাণী কিছুক্ষণ নতমস্তকে চুপ ক'রে থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে

ধীরভাবে বললেন, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আপনি চ'লে আসার পর থেকে আপনাকে এ অনুরোধ করব কিনা দিবারাত্র ভেবেছি। বুঝতে পারছি, এ অনুরোধ করা উচিত নয়, তবুও এ অনুরোধ না ক'রে আমার উপায় নেই। অনুরোধ রাখা না-রাখা আপনার ইচ্ছে। তবে জেনে রাখুন, এর ওপরে আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

একটি পরম বিস্ময়কর ঘটনার সংঘটনের প্রতীক্ষায় তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। রাণী নতমস্তকে স্থির ভাবে ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, আপনার বিয়ে করা চলবে না।

বুকের ভিতরটা দুলে উঠল তাঁর। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হ'ল, কেন ? চুপ ক'রে রইলেন।

রাণীজী বলতে লাগলেন, আপনার বোনের বিয়ে আপনি যেখানে হোক স্থির করুন। যা খরচ হবে আমি দেব। চেক আমি সই ক'রে এনেছি।—ব'লে শালের ভিতর থেকে চেক-বই বার করলেন।

তিনি বললেন, ওটা আপনার কাছেই থাক্। আপনার আদেশমতই কাজ হবে।

রাণী এবার মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, আদেশ নয়, প্রার্থনা—ভিক্ষা। আপনাকে আমি নিজের জন্যে চাই,

আপনাকে না হ'লে আমার চলবে না, আমি বাঁচতে পারব না।—ব'লে দুই প্রসারিত করতলে মুখ চেপে অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে বললেন, মনকে অনেক রকম ক'রে বুঝিয়েছি, অনেক চেষ্টা করেছি নিরস্ত করতে, মন কোন কথা শুনছে না। কণ্ঠ রোধ হয়ে এল কান্নাতে।

সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রাণীর মুখটি তুলে ধরেছিলেন। মুদ্রিত চোখ দুটি থেকে অবিরল অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল। সারা মুখখানিতে আত্মসমর্পণের আকূতি স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে ফুটে উঠেছিল।

ধীরে ধীরে তিনি হৈমবতীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এসেছিলেন। হৈমবতী সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শিথিল দেহটি দুই বাহু দিয়ে বুকের ওপরে সন্তর্পণে চেপে ধরেছিলেন তিনি।

দেহের শিরায় শিরায় তপ্ত রক্তস্রোত উন্মত্ত বেগে বইতে লাগল। বুকের মধ্যে মাদল বাজতে লাগল। অন্তরের মধ্যে দুরন্ত কামনা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করল। সবলে নিজেকে সংবরণ ক'রে হৈমবতীর অশ্রুসিক্ত লজ্জারক্ত কপোলে একটি চুম্বন মুদ্রিত করলেন।

হৈমবতী বললেন, আমার সঙ্গে আজই আপনাকে যেতে হবে।

তিনি বলেছিলেন, আজ থাক্‌, মা—

হৈমবতী বাধা দিয়ে বললেন, মাকে বুঝিয়ে বলবেন, খোকার অসুখ, বাড়িতে কেউ নেই।

সঙ্গে যেতে হ'ল। সেদিন অনেক রাত্রে হৈমবতীর শয়নকক্ষে গিয়েছিলেন। সারা রাত্রি কাটিয়েছিলেন ওর পাশে, ওর শয্যায়।

পরদিন রাণী সন্ধ্যায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন। পরেছিলেন একটা কালো রঙের অলস্টার। মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। চৌরঙ্গীতে তাঁর পরিচিত ফোটোগ্রাফারের স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলেন। দোতলায় স্টুডিও। বসবার ঘরে গিয়ে বসলেন দুজনে। পাশেই প্রসাধন-কক্ষ। হৈমবতী কক্ষে প্রবেশ করলেন। যখন বেরোলেন, তাঁকে দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলেন তিনি। বিধবার বেশ ত্যাগ ক'রে সধবার বেশে সজ্জিত হয়েছেন। পরেছেন গাঢ় নীল রঙের জর্জেট শাড়ি, ওই রঙের ব্লাউজ। সর্বাঙ্গে হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার। মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। মুখে কৌতুকের হাসি। বিদ্যুতের অত্যুজ্জ্বল আলোতে তাঁর মুখখানি শীতের নির্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করতে লাগল।

কাছে এসে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখছ কি এত চোখ বড় ক'রে? ছবি তোলা হবে, সাজব না?

পর পর কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে গেলেন। নানা ছবির ওপর চোখ পড়ল। নানা ঘটনার কথা মনে পড়ল। রাজপুত্রের দেশভ্রমণের শখ হ'ল। সঙ্গে গেলেন তিনি ও হৈমবতী। ভারতের প্রধান প্রধান শহরে ছবি তোলা হ'ল। একসঙ্গে অথবা একা একা। তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ও হৈমবতী। ছবি তুলেছিল রাজপুত্র। আগ্রায় একটা বড় হোটেলে ছিলেন। রাজপুত্র ঘুমোতে যাবার পর হৈমবতী তাজমহল দেখতে যাবার আবদার ধরলেন। যেতে হ'ল। শুক্লা তিথি চলছিল। দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী। শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে আকাশ ও পৃথিবী ঝলমল করছিল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাজমহলের জ্যোৎস্নাস্নাত অমলধবল সৌন্দর্য তাঁরা প্রাণ ভ'রে দেখেছিলেন। হৈমবতী বলেছিলেন, পৃথিবীতে এত বড় ভাগ্য আর কোন মেয়ের কোনদিন হয়েছে কি? টাঙায় ফিরেছিলেন পাশাপাশি ঘেঁষাঘেষি ব'সে। হৈমবতীর হাতটি তাঁর কোলের ওপরে প'ড়ে ছিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিলেন হৈমবতী, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমি ম'রে গেলে তুমি আমার স্মৃতিকে এমনই চিরদিন অমর অক্ষয় ক'রে রাখতে পারবে না?

আরও কতগুলো ছবি পর পর চোখে পড়ল। একটা ছবি, রাজপুত্র, তিনি ও মন্ত্রী মশায়। রাজপুত্র স্কুলের শেষ পরীক্ষায়

দ্বিতীয় বিভাগে পাস করল। খবর আসবামাত্র রাণীজীর কি আনন্দ! সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন তাঁকে। তাঁর দু হাত জড়িয়ে ধ'রে কিছুক্ষণ নীরবে তাঁর চোখে চোখ মিলিয়ে তাকিয়ে রইলেন। দুই হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগে তাঁর দুই চোখ বাষ্পময় হয়ে উঠেছিল।

সারা রাজ্যে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল দিন কয়েক ধ'রে। প্রজাদের আমোদ-আহ্লাদ, খানাপিনার জন্য রাণী নিজের তহবিল থেকে মোটা টাকা দিলেন। রাজপ্রাসাদে মন্ত্রী মশায় ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পান ও ভোজনের ব্যবস্থা হ'ল। সর্বশেষে ছবি তোলাও হ'ল।

আর একটা ছবি। মন্ত্রী মশায়ের মৃতদেহের ছবি। একটা খাটের ওপরে শায়িত। সাদা চাদরে আকণ্ঠ ঢাকা। গলায় ফুলের গোড়ে মালা। রাজপ্রাসাদ থেকে দেওয়া হয়েছিল, রাজপুত্র ও রাণীর পক্ষ থেকে।

তার পর ছবির পর ছবি। মন্ত্রী মশায়ের মৃত্যুর পর রাণীজীর সুপারিশে স্মিথ সাহেবের আনুকূল্যে মন্ত্রীত্বপদ পেলেন। প্রাণপণে রাজার ও প্রজার কল্যাণসাধন ক'রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। প্রজাদের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করলেন। মৃত রাজার নাম অনুসারে নামকরণ হ'ল জগৎনারায়ণ ইনস্টিট্যুশন। ভাল হাসপাতাল স্থাপনা করলেন—হৈমবতী

হাসপাতাল। ভাল ভাল ডাক্তার আনলেন কলকাতা থেকে। দরিদ্র প্রজাদের ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করলেন। প্রসবাগার স্থাপনা করলেন মেয়েদের জন্য। অচিরে প্রজাদের চিত্ত জয় করলেন তিনি। বলা বাহুল্য, প্রতিটি কাজে হৈমবতী মুক্তহস্তে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সাহস দিয়েছিলেন, উৎসাহ দিয়েছিলেন; অন্দরের মধ্যে থেকেও নানাপ্রকারে প্রজাদের মনকে তাঁর প্রতি অনুকূল ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি জয়লাভের আনন্দে সমান অংশ গ্রহণ ক'রে তাঁকে ধন্য করেছিলেন।

একটি ছবির ওপরে চোখ পড়ল। জগৎনারায়ণ ইনস্টি-ট্যুশনের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভার ছবি। রাজপুত্র সভাপতিত্ব করেছিল। পুরস্কার বিতরণ করেছিল। তিনি ও রাজপুত্র মাঝখানে ব'সে। তাঁর পাশেই হেডমাস্টার মশায়—হেমবাবু। আগে সরকারী স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁর বিশেষ অনুরোধে এই স্কুলের ভার নিয়ে-ছিলেন। দু পাশে আরও অনেক শিক্ষক ব'সে আছেন। পিছনেও দাঁড়িয়ে আছেন জনকয়েক শিক্ষক। তাঁদেরই সঙ্গে স্কুল অফিসের হেডক্লার্ক ব্রজলাল। একটু দূরে দারোয়ান ও চাকরেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজপুত্র লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেছিল। তিনিই লিখে দিয়েছিলেন।

ব্রজলালের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ জগদীশ-প্রসাদ। বেঁটে খাটো কাহিল চেহারা। কালো রঙ। মন্ত্রী মশায়ের নিকট-আত্মীয়। নিজের খরচে ওকে শহরে পাঠিয়েছিলেন পড়াশুনার জন্য। মন্ত্রী মশায়ের ইচ্ছা ছিল, ওকে মন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে দিয়ে নিজে অবসর গ্রহণ করবেন। স্মিথের কাছে দরবারও করেছিলেন। স্মিথ মন্ত্রী মশায়কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ব্রজলাল যদি বি. এ. পাস করতে পারে তা হ'লে ওকে মন্ত্রিত্বের জন্য সুপারিশ করবেন। ব্রজলাল আই. এ.-ই পাস করতে পারল না কিছুতেই। বাধ্য হয়ে তাকে মন্ত্রিত্বের বদলে কেরানীর চাকরি নিতে হ'ল। কিন্তু তাঁর উপরে তার মন বরাবরই ঈর্ষান্বিত হয়ে রইল। মুখে দেঁতো হাসি হেসে হাত কচলাতে কচলাতে আনুগত্য জানাত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করত। একবার রাণীর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে কুৎসা-প্রচারমূলক পুস্তিকা প্রকাশ ক'রে প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। তাতে ইঙ্গিত করেছিল যে, তিনি রাণীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্টেটের সমস্ত ধন বাংলা দেশে পার ক'রে দিচ্ছেন। এর ফলে অনেক প্রজার মনে, বিশেষ ক'রে যারা স্বভাবত বাঙালীবিদ্বেষী তাদের মনে, অসন্তোষ জেগে উঠল। ক্রমে ব্রজলালের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় তাঁকে রাজ্য থেকে তাড়াবার জন্য, প্রয়োজন হ'লে তাঁকে হত্যা

করবার জন্য, একটি চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠতে লাগল। প্রজাদের মধ্যে অনেক লোক ছিল যারা রাণীর কাছ থেকে গোপনে সাহায্য পেত। তাদের কাছ থেকে তিনি প্রজাদের অনেক গোপন খবর পেতেন। এ খবরও যথাসময়ে পেয়ে গেলেন। তাঁকে সমস্ত খবর জানিয়ে সতর্ক ক'রে দিলেন। মন্ত্রীর মৃত্যুর পর রাণী পুরাতন পাইক ও বরকন্দাজদের বিদায় দিয়ে নূতন লোক নিযুক্ত করেছিলেন। সব তাঁর বাবার কলিয়ারিতে কাজ করত। তাঁর অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বাসী ছিল তারা। এদেরই কয়েক জনকে ব্রজলালকে সায়েস্তা করবার ভার দিলেন। ব্রজলাল সাধারণত বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া-আসা করত। সুবর্ণরেখা নদী রাজ্যের মাঝ দিয়ে পার হয়ে গেছে। নদীর ওপারে বাড়ি ছিল তার। বর্ষাকালে যাওয়া-আসার অসুবিধা হ'ত ব'লে স্টেটের কর্মচারীদের সঙ্গে থাকত। একদিন ব্রজলাল স্কুলে অনুপস্থিত হ'ল। পরদিনও। অসুস্থ হয়েছে অনুমান ক'রে হেডমাস্টার মশায় তার খবর নিতে লোক পাঠালেন। ব্রজলালের স্ত্রী ব'লে পাঠাল—তিনি বাড়িতে নেই। বিশেষ কাজে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে শহরে যাবেন, কাজেই দিন কয়েক বাড়িতে ফিরতে পারবেন না—জানিয়ে গেছেন। শহরে খোঁজ করা হ'ল। ব্রজলালের পাত্তা পাওয়া গেল না।

সুবর্ণরেখার তীরে একটা ছোট পাহাড়ের কোলে রাজা

জগৎনারায়ণ একটি প্রমোদ-ভবন নির্মাণ করিয়েছিলেন। তারই একটি কক্ষে ব্রজলাল আবদ্ধ ছিল। নিজে গিয়ে দিনের পর দিন তাকে চাবুক কষিয়ে সমস্ত ষড়যন্ত্রের খবর বার ক'রে নিয়েছিলেন তিনি। তার পর খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। সুবর্ণরেখার স্বর্ণকণাময় বালুর সঙ্গে তার দেহের ভস্মকণা মিশে গেছে।

ব্রজলালের স্ত্রী রাণীর পায়ে এসে কেঁদে পড়েছিল। রাণী মাসিক অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করলেন তার ও তার শিশুপুত্রের জন্য। ব্রজলালের সঙ্গীদের ধীরে ধীরে একে একে পিষে মেরে ফেলা হ'ল।

প্রমোদ-ভবনের ছবি। একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। তার পাশেই একটা ছবিতে তিনি ও রাণী। পাশাপাশি দুটি ঈজি-চেয়ারে ব'সে। আর একটাতে তিনি ও রাজপুত্র—পরনে ব্রীচেস্, হাফহাতা শার্ট, মাথায় হ্যাট। হাতে বন্দুক। রাজপুত্র ও তিনি শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তোলা হয়েছিল ছবিগুলি।

হঠাৎ আর একজনের কথা মনে পড়ল জগদীশপ্রসাদের। মহাদেও পাণ্ডে। স্টেটের একজন কর্মচারীর পুত্র। কর্মচারী হঠাৎ মারা গেলেন। রাণী কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। মহাদেও বড়

ছেলে। স্টেট থেকে খরচ দিয়ে কলেজে পড়ানো হয়েছিল। আই. এ. পাস ক'রে বি. এ. পড়ছিল। ১৯৩০-এর লবণ-আন্দোলনের সময়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে রাজ্যে আন্দোলন শুরু করল। প্রজাদের খাজনা বন্ধ করার জন্য উস্‌কানি দিতে লাগল। আদিবাসীরা চিরদিন রাজার বাধ্য প্রজা। তাদের ক্ষেপাবার চেষ্টা করল। একটা কারণও ঘটেছিল তখন। তিনি জঙ্গল থেকে স্টেটের কিছু আয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন। একজন ফরেস্ট অফিসার ও তাঁর অধীনে জন কয়েক কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন জঙ্গল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। আদিবাসীরা জঙ্গলের কাঠ এতদিন বিনা অনুমতিতে বিনা মূল্যে কেটে নিয়ে যেত। সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমন কি দু-চার জনের আইন-ভঙ্গের জন্য শাস্তিও হয়েছিল। এই নিয়ে আদিবাসীদের মনে অসন্তোষের আগুন ধোঁয়াচ্ছিল মাস কয়েক ধ'রে। মহাদেও বক্তৃতার পেট্রোল ঢেলে সেই আগুনকে দাউদাউ ক'রে জ্বালিয়ে দিল। আদিবাসীরা একজন বন-বিভাগের কর্মচারীকে মেরে ফেলল। অফিসঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। এমন কি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ক'রে তাঁকে টেনে বার ক'রে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে—এমনই ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে শোনা গেল। এবারেও রাণীজী স্বহস্তে হাল ধরলেন। একদিন শেষরাত্রে তাঁকে নিয়ে আদিবাসীদের গ্রামে

গিয়ে হাজির হলেন। যখন পৌঁছুলেন তখন ভোর হয়েছে। ড্রাইভার গিয়ে জনকয়েক চাঁইকে ডেকে নিয়ে এল। তারা রাণীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। মাটিতে মাথা লুটিয়ে অভিবাদন করল। রাণী তাদের বললেন, তোমরা মন্ত্রীকে মারতে চাও শুনলাম। তাঁকে তোমাদের কাছে ধ'রে এনেছি। তাঁকে মারো। কিন্তু তার আগে আমাকেও মারো। আমার নাবালক ছেলে। তার সর্বনাশের জন্যে মহাদেওয়ের দলের লোক চেষ্টা করছে। তারা জানে, তোমরা আমাদের অত্যন্ত আপনার লোক। তাই তোমাদের মন বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। তোমরা তার কথা শুনবে, আমি কখনও আশা করি নি। তোমাদের রাজাকে কি তোমরা ভুলে গেছ? তাঁর কাছে কি তোমরা কোন উপকার পাও নি যে তাঁর ছেলের সর্বনাশ করছ?

তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন রাণীর বক্তৃতা শুনে। সেদিন তাঁর সারা মুখে এমন একটি অপরিমেয় তেজের অনির্বচনীয় দীপ্তি, সিংহ-বাহিনী জগদ্ধাত্রীর মত এমন দৃপ্ত মহিমা তিনি দেখেছিলেন যে, তাঁর চিত্ত চিরদিনের জন্য তাঁর পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছিল। আদিবাসীদের চাঁইরাও। তারা তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে বার বার অপরাধ স্বীকার করতে লাগল।

রাণীজী বললেন, তোমাদের বরাবর সন্তান ব'লেই জানি।

মায়ের যদি দোষ হয়ে থাকে—তোমরা মাকে কি মারবে? না, মায়ের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে বলবে? নতমস্তকে মাটির উপরে ব'সে রইল সব। রাণীজী জোর দিয়ে বললেন, যদি মারবেই তো মেরে ফেল এখনই, আমি তো মরবার জন্যেই এসেছি তোমাদের কাছে। মন্ত্রী তো আমার কর্মচারী। আমি যা বলেছি তিনি করেছেন। দোষ তো তাঁর কিছু নেই।

মিটমাট হয়ে গেল। জঙ্গল যেমন আদিবাসীরা বরাবর ব্যবহার ক'রে আসছে তেমনই করবে। রাণী তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দেবেন, তারা যেন কোন বাধা না দেয়। কিন্তু যারা তাঁর সর্বনাশ করছে তাদের শাস্তি যেন তারা দেয়—এই প্রার্থনা তিনি তাদের কাছে বার বার জানালেন।

তাঁর প্রার্থনা তারা রক্ষা করেছিল। দিনকয়েক পরে মহাদেও যে কোথায় গেল কেউ বলতে পারল না, জানতেও পারল না। আন্দোলনও থিতিয়ে এল কিছুদিনের মধ্যে।

আর একটা ছবি। রাজপুত্র ও রাণী। রাণী রাজপুত্রকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ও রাজপুত্রের দুজনেরই মুখ হাস্যমণ্ডিত। রাজপুত্র বি. এ. পাস করলেন। তাঁরই শিক্ষাধীনে ছিলেন বরাবর। মন্ত্রীত্বের নানা গুরুতর কাজে ব্যস্ত থেকেও রাজপুত্রকে নিয়মিত পড়াতেন তিনি। পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। যেদিন খবর এল, রাণীর

কি আনন্দ! চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। একান্তে ডেকে বুকে মুখ রেখে বলেছিলেন, চিরদিনের কেনা-দাসী হয়ে রইলাম। এবারও রাজ্যে আনন্দের ঢেউ বইয়ে দেওয়া হ'ল। সমস্ত প্রজাদের খাওয়ানো হ'ল সাত দিন ধ'রে। দরিদ্র প্রজাদের ধুতি-শাড়ি বিতরণ করা হ'ল; স্কুলের ছেলেদের মিষ্টান্ন খাওয়ানো হ'ল।

রাণী ও রাজপুত্রের ছবি তুললেন তিনি নিজে।

আর এক পৃষ্ঠা ওল্টালেন। অনেকগুলি ছবি চোখে পড়ল পর পর। রাজপুত্রের বিয়ের ছবি। বরবেশে সজ্জিত অবস্থার ছবি। বর-কনের ছবি। রাজপুত্র, বউরাণী ও রাণীর ছবি।

রাজপুত্রের বিয়ে হ'ল এক বড় স্টেটের রাজকন্যার সঙ্গে। রাজপুত্রের প্রায় সমবয়সী মেয়েটি। লম্বা ছিপছিপে গঠন। ধবধবে ফরসা রঙ। মুখের ডৌলটিও চমৎকার। সুর্মা আঁকা আয়ত চোখ। রূপসী। গর্বিতা। মুখের রেখায় রেখায়, চোখের চাহনিতে, ওষ্ঠের বঙ্কিম ভঙ্গিমায় গর্ব যেন ফেটে পড়ত। রূপের গর্ব, পিতৃকুলের গর্ব, পিতৃ-ঐশ্বর্যের গর্ব। রাণীকেও অবজ্ঞার চক্ষে দেখত ব্যবসাদারের কন্যা ব'লে। বনত না তাঁর সঙ্গে। পুত্রবধূর অহমিকা ও ঔদ্ধত্য তাঁকে রাজসংসারে প্রতিদিনের প্রতি কাজে আঘাত করতে লাগল। তিনি ধীরে ধীরে সংসারের কর্তৃত্ব পুত্রবধূর হাতে ছেড়ে দিয়ে দূরে স'রে রইলেন।

তাঁর মাতৃ-হৃদয় প্রতি মুহূর্তে আশা করত, তাঁর ভাব-বৈলক্ষণ্য পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পুত্র প্রতিবাদ করবে, শৈশবে পিতৃহীন পুত্রের কাছে মায়ের যে কোথায় স্থান ও মাতৃস্নেহের কি মূল্য পত্নীকে বুঝিয়ে তাকে অনুতাপে পীড়িত করবে ও তাঁকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে সংসারে তাঁর নিজস্ব যথার্থ মর্যাদার স্থানটিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু পুত্র নবোঢ়া পত্নীর রূপ ও যৌবনের মদিরা দিনের পর দিন আকণ্ঠ পান ক'রে এমন দিবারাত্র বিকল ও বিহ্বল হয়ে রইল, মাতৃ-হৃদয়ের নিগূঢ় অভিমান তার মনকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারল না। নবীনার রূপ ও যৌবনের কাছে মাতৃস্নেহের শোচনীয় পরাজয় ঘটল।

রাজপ্রাসাদ থেকে তাঁকে চ'লে আসতে হয়েছিল। কাছারি-বাড়িটা দোতলা। দোতলায় তিনি থাকতেন তখন। রাজবাড়ির একজন পুরাতন চাকর রান্না-বান্না করত, অন্যান্য কাজকর্ম করত। একদিন অনেক রাত্রে রাণী রুক্মিণীকে সঙ্গে ক'রে এলেন। তাঁকে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ভীত হয়ে উঠলেন। বললেন, কেউ দেখলে কি বলবে? তাঁর বিছানায় এসে ব'সে ছিলেন হৈমবতী। মুখ থমথম করছিল। চোখ দুটিতে অপরিসীম ব্যথা জমাট হয়ে ছিল। করুণ মর্মভেদী আর্তনাদ ওই দুটি দৃঢ়নিবদ্ধ অধরোষ্ঠে যেন সংহত স্তব্ধ হয়ে

ছিল। কথাটা কানে গেল না। আবার বললেন, এমন ক'রে আসা উচিত হয় নি। লোকে দেখলে কি বলবে? এবার হৈমবতী ধীরে ধীরে বললেন, আর আমি থাকতে পারছি না ওখানে। আমি এখানেই থাকব, যাব না। আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও।

তিনি কাছে বসতেই হৈমবতী তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কান্না-জড়ানো স্বরে পুত্রের নাম ক'রে বললেন, আমার ঘরের সামনে দিয়ে পার হয়ে যায়। মা ব'লে ঘরে ঢোকে না। এ কি সহ্য করা যায়! বল তুমি? তুমি তো জান সব!

ধীরে ধীরে তাঁর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। ওঁকে বুকে চেপে রেখে, নিজের অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি ফেলে দেখতে পেয়েছিলেন সেদিন—হৈমবতীকে সমস্ত দুঃখ, বেদনা ও মনস্তাপ থেকে আড়াল ক'রে রাখবার জন্য একটি গভীর স্নেহ ও মমতা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সেখানে।

সেদিন অনেক বুঝিয়ে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এর কিছু দিন পরে তাঁর বাবার অসুখের খবর এল। তিনি অবিলম্বে চ'লে গেলেন।

তাঁকেও চলে আসতে হ'ল কিছুদিন পরেই। রাণী চ'লে আসবার পরই বউরাণীর বাবা কন্যা-জামাতাকে দেখতে এলেন।

রাণী চ'লে আসবার পরই স্টেটের কর্মচারীরা তাঁকে পদে পদে অমান্য ও অপদস্থ করতে লাগল। বউরাণী নাকি পিছন থেকে তাদের উৎসাহিত করছিলেন। তিনিই নাকি তাঁর বাবাকে খবর দিয়ে রাজ্য পরিচালনার সুব্যবস্থার জন্য আনিয়েছিলেন। রাজাবাহাদুর এসেই তাঁর প্রত্যেকটি কাজে বাধা দিতে লাগলেন, ভুল ধরতে লাগলেন। তিনি যে এ কাজের অযোগ্য এ কথা ভাবে-ভঙ্গীতে কথাবার্তায় তাঁকে এবং সকলকে জানাতে লাগলেন। এর কিছু আগে স্মিথ সাহেব বিলেত চ'লে গিয়েছিলেন। নূতন সাহেব যে এসেছিল, তার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল না। প্রজাদের মধ্যেও তাঁর প্রতি বিদ্বেষ-ভাব ছড়ানো হতে লাগল। যে সব বাঙালীকে তিনি নানা কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তাদের একে একে তাড়ানো হতে লাগল। হেডমাস্টার মশায় আগেই চ'লে গিয়েছিলেন। রাণী যে সব পাইক-বরকন্দাজ নিযুক্ত করেছিলেন, তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বলা বাহুল্য, এর কোনটিতে তাঁর বিন্দুমাত্র মত নেওয়া হ'ল না। শেষে তাঁর বিরুদ্ধে স্টেটের অর্থের অযথা অপব্যয়ের জন্য মামলা আনবার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। রাজপুত্র জানতে পেরে বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মাস্টার সাহেব যা করেছেন, আমার মঙ্গলের জন্য করেছেন। ওঁর যেন কোন অপমান না হয়।

তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। রাজপুত্র তাঁকে নিজের গাড়ীতে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আর এক পৃষ্ঠা ওল্টালেন জগদীশপ্রসাদ। এ পৃষ্ঠাতেও কয়েকটি ছবি। একটা ছবি—তিনি, হৈমবতী ও তাঁর বাবা। হৈমবতীর বাবা মাঝখানে একটা ঈজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত—আপাদবক্ষ শাল দিয়ে ঢাকা, তুপাশে তাঁরা তুজন। হৈমবতীদের কয়েকটা কলিয়ারি দামোদরের পাশে। দামোদরের তীর থেকে কতকটা দূরে একটা টিলার উপরে একটি চমৎকার বাংলো তৈরি করেছিলেন হৈমবতীর বাবা। যখন কলিয়ারিতে যেতেন, ওই বাংলোতে থাকতেন। বাংলোর বারান্দাতে বসলে শীতে ও গ্রীষ্মে দামোদরের শুভ্র বালুবক্ষ এবং বর্ষায় গর্জমান, গৈরিক জলস্রোত স্পষ্ট দেখা যেত। নদীর ওপারে সবুজ বনভূমি ও দিগন্তলগ্ন উচ্চাবচ নীল গিরিশ্রেণী দৃষ্টি ও মনকে নীরব নিমন্ত্রণ জানাত। ওই বাংলোর বারান্দাতে ছবি তোলা হয়েছিল।

মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে কলকাতা ফিরে গেলেন। হৈমবতীর বাবাকে দেখতে গিয়েছিলেন। গুরুতর অসুস্থ। একেবারে শয্যাশায়ী। তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। সমস্ত পরিচয় নিলেন। সেদিন বিদায় নেবার সময়ে হৈমবতী এলেন সঙ্গে সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় উঠেছ? বললেন,

একটা মেসে। হৈমবতী বললেন, মেসে কেন ? আমি এখানে রয়েছি। কি রকম লোক যে তুমি ! এখানে চ'লে আসবে। ঠিকানা দিয়ে যাও। গাড়ি পাঠিয়ে দেব কাল সকালেই।

হৈমবতী টেনে নিয়ে গেলেন ওঁদের বাড়িতে। চাকরিও হয়ে গেল। হৈমবতীর বাবার সহকারী। অসুস্থতার জন্য কাজকর্ম নিজে দেখতে পারছিলেন না। তাঁর ওপর দেখাশুনা করার ভার পড়ল। হৈমবতীর বাবার শরীর আর পূর্বের স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে পায় নি। তিনিই ধীরে ধীরে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন।

কলকাতায় হৈমর বাবার শরীর সারছিল না। ডাক্তাররা বায়ু-পরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। তিনি কলিয়ারির ওই বাংলোতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হৈমবতী গিয়েছিলেন সঙ্গে। তিনি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতেন। একবার যাওয়ার পরে ছবি তোলা হ'ল।

পাশাপাশি কয়েকটি ছবি চোখে পড়ল। তাঁর ও হৈমবতীর একসঙ্গে ছবি। পুরীর সমুদ্র-সৈকতে। দার্জিলিং, সিমলা, নৈনিতাল প্রভৃতি শৈলাবাসে। ভারতের নানা তীর্থে।

হৈমবতীর বাবা বৎসর দুই পরে মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হৈমবতীকে উইল ক'রে দিয়ে গেলেন হৈমবতী তাঁর জীবিতকালে সম্পত্তি সম্বন্ধে যা ইচ্ছা ব্যবস্থা

করতে পারবেন, যাকে ইচ্ছা দান বা বিক্রয় করতে পারবেন, এতে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না—এ কথা তিনি স্পষ্টভাবে লিখে দিয়ে গেলেন।

বাবার মৃত্যুর পর হৈমবতী দিন কয়েক কান্নাকাটি করলেন। তারপর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-পিপাসা নিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। পুরাতন বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন ও দাস-দাসীদের ভিড়ে তাঁকে যেমন ভাবে যতখানি চাইতেন, তেমন পেতেন না। কয়েক মাস পরেই কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে একটি শান্ত নিরালা পল্লীতে একটি ছোট দোতলা বাড়ি কিনে তাঁকে নিয়ে সংসার পাতলেন। সঙ্গে পুরনো দাসদাসী কাউকে আনলেন না। সঙ্গে এল শুধু রুক্মিণী। সংসারের কোলাহল ও কৌতূহল থেকে দূরে এই একান্ত নিভৃত পরিবেশে হৈমবতী নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলেন তাঁর ব্যগ্র আলিঙ্গনের মধ্যে। নিজেকে হবির মত নিঃশেষে আহুতি দিলেন তাঁর কামনার অগ্নিকুণ্ডে। হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে তাঁর ক্ষুধিত চিত্তকে তৃপ্ত করলেন। বর্ষার দাক্ষিণ্য-ভরা সজল মেঘের মত অন্তরের রসভার নিঃশেষে বর্ষণ করলেন তাঁর শুষ্ক পিপাসিত জীবনের 'পরে। দেখতে দেখতে জীবনের সব শূন্যতা ভ'রে গিয়ে সমগ্র জীবনখানি বর্ষান্তে কানায়-কানায় পরিপূর্ণ সরোবরের মত সুখ ও সম্পদের, ভোগ ও ভোগ্যের প্রাচুর্যে টলটল করতে লাগল।

মাঝে মাঝে কলকাতা ছেড়ে যেতেন তাঁরা। সঙ্গে থাকত শুধু রুক্মিণী। ভারতের নানা তীর্থস্থানে যেতেন। দেবতার সামনে লুটিয়ে প'ড়ে পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন হৈমবতী। তাঁরও। পরিপূর্ণ মিলনের প্রগাঢ় পরিতৃপ্তি তাঁর প্রেমকে ধীরে ধীরে আবেগ ও আবিলতাহীন ক'রে তুলছিল। শান্ত, স্নিগ্ধ, গাঢ় ক'রে আনছিল। ভোগ নয়, সেবার জন্য তাঁর হৃদয়কে ব্যাকুল করে তুলছিল। বিদেশে দাস-দাসীহীন দু-দিনের জন্য নূতন পাতা সংসারে নিজে সব কাজ করতেন। পতিব্রতা স্ত্রীর মত তাঁর সেবা করতেন। তাঁর সমস্ত কাজ নিজে করতেন। এমন কি জুতো বুরুষ পর্যন্ত ক'রে দিতেন। একবার তাঁর অসুখ হয়েছিল কোন একটা জায়গায়। হৈমবতী দিবারাত্র সেবা করেছিলেন।

আরও কয়েকটি ছবি পার হয়ে গিয়ে জগদীশপ্রসাদের দৃষ্টি একটি ছবির উপরে স্থির হয়ে রইল। একটি চৌকির উপরে তাঁর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন হৈমবতী—তাঁর হৈম। সর্বাঙ্গ শাল দিয়ে ঢাকা। শীর্ণ, পাণ্ডুর মুখখানিতে গভীর ক্লান্তি। কোটরগত দুটি চোখের দৃষ্টিতে সংসারের সব-কিছুর উপরে পরম ঔদাসীন্য।

একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ একটি তীক্ষ্ণ, বিষমুখ শরের মত তাঁর জীবনের মর্মমূলে বিদ্ধ হয়েছিল। বাহ্যিক আনন্দ ও

ভোগ-বিলাসের অন্তরালে সকলের অলক্ষ্যে একটি মর্মান্তিক, নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা তাঁর চেতনাকে ক্রমে অসাড় ক'রে আনছিল এবং প্রাণঘাতী বিষের ক্রিয়া ধীরে ধীরে তাঁর জীবনীশক্তি ক্ষয় ক'রে আনছিল। মাঝে মাঝে তাঁর ইস্পাতের মত কঠিন ধৈর্য ভেঙে পড়ত ; কাঁদতেন তাঁর কাছে। তিনি বলতেন, ওকে একবার আসতে চিঠি লেখ না। হৈমবতী সক্ষোভে ব'লে উঠতেন, ছিঃ! চিঠি লিখব! বল কি! একটিবার দেখা পাবার জন্যে ভিখারীর মত করজোড়ে প্রার্থনা করব! পরম ঘৃণায় ও ক্ষোভে বলে উঠতেন, ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! তারপর শান্ত হয়ে উঠতেন ক্রমে।

ধীরে ধীরে অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে বলতেন, 'আমার একমাত্র সন্তান, নয়নের মণি, আমার সর্বস্ব'—কণ্ঠরোধ হয়ে আসত কান্নায়—সামলে নিয়ে বলতেন, 'আমার জীবনের জীবন, সেই রাক্ষসীর মায়ায় এমন ক'রে ভুলে গেল আমাকে যে আজ এতদিনের মধ্যে একবার আমাকে দেখতে এল না! এ কোন মা সহ্য করতে পারে?' দুটি অশ্রু-সজল চোখের করুণ দৃষ্টি তাঁর মুখের পরে ন্যস্ত ক'রে বলতেন, বল তুমি—আর সহ্য করা যায়? ধীরে ধীরে তাঁকে বুকে টেনে আনতেই তাঁর বুকে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন কতক্ষণ। তারপর শান্ত হয়ে উঠে অশ্রু-গাঢ় কণ্ঠে বলতেন, ভাগ্যে তুমি ছিলে! তোমার বুকে আশ্রয় না পেলে পাগল হয়ে যেতাম—

ছায়াছবি

হৈমবতীর দেহে ক্ষয়রোগ প্রকাশ পেল। দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করলেন। প্রাণ দিয়ে সেবা করলেন তিনি। সেবা করল প্রিয় দাসী রুক্মিণী। বহু স্বাস্থ্য-নিবাসে বহুদিন ধ'রে রাখা হ'ল। কিছুতেই কিছু হ'ল না। ধীরে ধীরে প্রাণ-শিখা স্তিমিত হয়ে এল। শেষে নিবে গেল একদিন।

শেষ হ'ল হিমালয়ের বুকে এক শৈলাবাসে। মৃত্যুর আগের দিন হৈমবতী বললেন, তোমার কোলে মাথা রেখে একটা ছবি তোলাতে চাই। দিনান্তের শেষ হাসির মত ক্লান্ত, করুণ হাসি হেসে বললেন, এত সেবা করলে, একটা নজীর রেখে যাব না? ছবি তোলা হ'ল। ছবি চোখে দেখে যেতে পারেন নি।

পার্বত্য এক তটিনীর তীরে হৈমবতীকে নিজের হাতে চিতায় তুলে দিয়েছিলেন। তটিনীর স্বচ্ছ শীতল জল দিয়ে চিতাভস্ম ধুয়েছিলেন নিজের হাতে। তারপর সীমাহীন রিক্ততা বুকে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়।

ঈজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে দুই চোখ বুজে, জগদীশপ্রসাদ হৈমবতীর মূর্তিকে চিত্তপটে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করলেন আর একবার। ফুটল না। চিত্তের অস্তাচলে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম নিয়েছেন হৈমবতী। কিন্তু সারা চিত্ত তাঁর হেমপ্রভায় এখনও দ্যুতিমান হয়ে রয়েছে। এমনই হয়। আবার উদিত

হবে। আবার চোখ বুজলেই চিত্তাকাশে ওঁর দেখা পাবেন। শুধু আজ নয়, জীবনের প্রতিদিন। ওঁকে কোনদিন ভোলেন নি। ভুলবেন না। উনি তাঁর জীবনের লক্ষ্মী, করুণাময়ী বরদাত্রী দেবী। ওঁরই করুণায় জীবন তাঁর সার্থক হয়েছে। ওঁরই সঙ্গসুধা আকণ্ঠ পান ক'রে জীবন পরিতৃপ্ত হয়েছে। ওঁকে কি ভোলা যায়! জীবনের দীপ্ত দ্বিপ্রহরকে কি কেউ ভুলতে পারে? স্তব্ধ নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে এখনও মনে হয় কোন কোনদিন—সেই কলকাতার বাড়িতে প্রথম রাত্রির মত—হৈমবতী তাঁর শয়নকক্ষে মুখে-চোখে কামনার শিখা জ্বালিয়ে, সর্বদেহে ভোগের নৈবেদ্য সাজিয়ে, ব্যাকুলচিত্তে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছেন—

তিন

তৃতীয় পর্ব শেষ হ'ল। চতুর্থ পর্ব সংগ্রাম-পর্ব। সংগ্রাম বইকি! জীবন-সংগ্রাম। শুরু হয়েছিল, পনের বৎসর আগে। এখনও শেষ হয় নি। নব নব যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করেছেন। চরম জয়লাভ এখনও হয় নি। কবে হবে? হবে কি? কে জানে?

নূতন পৃষ্ঠা খুলতেই এই পর্বের কয়েকটি ছবি চোখে পড়ল। তিনি ও রাজপুত্র। রাজপুত্র নয়। রাজা। সাবালক হয়ে রাজপাটে বসেছে। তিনি তখনও তাঁদের হৈমবতীর স্মৃতিভরা সেই ছোট বাড়িতে বাস করছিলেন। রুক্মিণী ছিল না। সে বাড়ি চ'লে গিয়েছিল। হৈমবতী তাকে তাঁর উইলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তিনিও দিয়েছিলেন এক হাজার টাকা। সে তাই নিয়ে দেশে চ'লে গিয়েছিল।

রাজপুত্র মাতামহের বাড়িতে ওঠে নি, সেখানে যদিও আত্মীয়-স্বজন ছিল। একটা বিলিতী হোটেলে উঠেছিল। সঙ্গে নূতন মন্ত্রী। তার স্ত্রীর দূর-সম্পর্কের ভাই। তাঁকে খবর

পাঠাতেই তিনি দেখা করলেন। রাজপুত্র ছাত্রের মতই ব্যবহার করল। প্রণাম করল। সবিনয়ে ও সশ্রদ্ধভাবে নিজের কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসাল।

মিটমাটের জন্য এসেছিল রাজপুত্র। হৈমবতী তাঁর সম্যক সম্পত্তি তাঁকে আইনসঙ্গতভাবে দান ক'রে গিয়েছিলেন। তাই নিয়ে মামলা শুরু করবার ভয় দেখালেন—রাজপুত্রের পক্ষ নিয়ে তার শ্বশুর। রাজপুত্র এটা পছন্দ করে নি সম্ভবত। এটা যাতে থেমে যায় তারই চেষ্টায় এসেছিল রাজপুত্র।

তিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন। শয়নকক্ষে বসিয়েছিলেন। শয়নকক্ষে—এক পাশের দেওয়ালে হৈমবতীর একটি তৈলচিত্র টাঙানো ছিল। একজন বিখ্যাত চিত্রকরকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন তিনি। ছবিটির নীচে একটি শ্বেত-পাথরের চৌকি। তার উপরে ধূপদানি। একটি রূপার সাজিতে নানা ফুল। প্রতিদিন প্রাতে নিজে হাতে সাজি ভ'রে ফুল এনে রাখতেন। হৈমবতীকে মনে মনে নিবেদন করতেন। ফুল বড় ভালবাসতেন হৈম। চার পাশের দেওয়ালে হৈমবতীর আরও অনেক ছোট-বড় ছবি।

রাজপুত্রকে বসিয়ে রেখে তিনি মিনিট কয়েক বাইরে গিয়েছিলেন। এসে দেখলেন, রাজপুত্র তার মায়ের ছবির কাছে করজোড়ে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বমুখে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ছু চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। তাঁকে দেখেই জানু পেতে ব'সে শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে মাথা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে থেকে ছাব্বিশ বৎসরের যুবক রাজা উবে গিয়ে একটি কিশোরমূর্তি প্রতিভাত হ'ল। প্রায় বারো বৎসর আগে একদিন সামান্য অবাধ্যতার জন্যে হৈমবতীর শাসনে রাজপুত্র মেঝেতে জানু পেতে ব'সে চেয়ারে মাথা রেখে কেঁদেছিল। সেই দিনের সেই রোরুদ্যমান কিশোর-মূর্তি চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি পাশে ব'সে সাদরে তাকে বুকে টেনে নিয়ে, একদা তার মাকে যেমন ক'রে সান্ত্বনা দিতেন তেমনি ভাবেই সান্ত্বনা দিলেন।

মিটমাটের সময়ে রাজপুত্র কোন কথা বলে নি। সব কথা বলল তার শ্যালক। সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দিয়ে মাসিক বেতনে কর্মচারীর মত তাদের সম্পত্তি দেখাশুনা করতে হবে তাঁকে। এতে তিনি রাজী না হ'লে মামলা অনিবার্য। তিনি বুঝতে পারলেন, মিটমাট হবে না। রাজপুত্রও বুঝল। কলকাতা থেকে যাবার আগের দিন সানুনয়ে বললে, একসঙ্গে আমাদের একটা ছবি তুলে নেবার ইচ্ছে আমার। জীবনে আর দেখা হবে কি না কে জানে? এক টুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার অধরোষ্ঠে। ছবি তোলা হ'ল সেই দিনই।

মামলা হয় নি। দেশের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ

করেছিলেন রাজাসাহেব। কেউ তাঁকে মামলা করতে পরামর্শ দেয় নি। তা ছাড়া রাজা নিজে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। সম্পত্তির জন্য, যত মূল্যবান্ সম্পত্তি হোক না কেন, তার মায়ের নামে কুৎসার কলঙ্ক লেপন করবার ষড়যন্ত্র সে সমর্থন করে নি। তার সুন্দরী, যুবতী স্ত্রীর অশ্রুজলও ব্যর্থ হয়েছিল।

হৈমবতীর বাবার মৃত্যুর পর থেকেই কলিয়ারির পরিচালন-ব্যবস্থা তিনি ধীরে ধীরে তাঁর মনোমতভাবে, তাঁরই অনুগত ও বিশ্বাসভাজন লোকদের তত্ত্বাবধানে গ'ড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর মেজ ভাই মাইনিং এঞ্জিনিয়ারিং ও ছোট ভাই মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পাস ক'রে তাঁদের কলিয়ারিতে চাকরি করছিল। বৎসর খানেক তাদের বিলেতে রেখে উন্নততর শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে আনলেন এবং এক-একজনকে এক-একটি বিভাগের শীর্ষদেশে স্থাপন করলেন। তাঁর ভগ্নিপতি ডাক্তারী পাস ক'রে গ্রামে ডাক্তারি করছিল। এরই বিবাহের সব খরচ হৈমবতী বহন করেছিল। ডাক্তারকে গ্রাম থেকে টেনে আনলেন এবং বৎসর খানেক বিলেত থেকে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত কলিয়ারির প্রধানতম চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করলেন। যে সব কর্মচারীর আনুগত্য সন্দেহজনক বোধ হ'ল, তাদের ক্রমে ক্রমে তাড়িয়ে দিয়ে, নিজের গ্রামের অথবা আত্মীয়-স্বজনদের ছেলেদের নিযুক্ত করলেন। বৎসর খানেকের মধ্যে সমস্ত

কলিয়ারির কাজ পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে লাগল। তিনি কলকাতায় থাকতেন সাধারণত, প্রয়োজন হ'লে সেখানে যেতেন।

কলকাতার ব্যবসায়ী মহলের কেষ্ট-বিষ্টুদের সঙ্গে ধীরে ধীরে আলাপ জমাতে লাগলেন। এতদিন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল। এখন প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে নূতন ক'রে পরিচয় শুরু হ'ল। মালিকত্বের ইতিহাস কারও অবশ্য অজানা ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের যাই ধারণা থাক, বুদ্ধি, চাতুর্য, কর্মক্ষমতা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সম্বন্ধে সকলেই উচ্চ ধারণা মনে মনে পোষণ করতেন। তা ছাড়া তিনি যে একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি—তাও তাঁরা জানতে পেরেছিলেন এবং সেজন্য বিশেষ সম্মান করতেন তাঁকে। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয়—এমন কি বন্ধুত্ব হ'ল—একজন গুজরাটী ব্যবসায়ীর সঙ্গে। একটি সুবৃহৎ সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মালিক। নাম—হীরালাল চন্দনলাল। হীরালাল গতায়ু হয়েছেন। একমাত্র পুত্র চন্দনলালই এখন সর্বেসর্বা। বয়স—পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। বাঙালীদের উপর খুবই শ্রদ্ধা তার। ভাল বাংলা বলতে পারত। বাঙালীদের হাব-ভাব, ধরন-ধারণ অনুসরণ করবার চেষ্টা করত। আধুনিকা বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ দুর্বলতা ছিল তার। পথে-ঘাটে কাউকে দেখলে

স্থান-কাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত হয়ে উঠে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকত।

হৈমবতী বেঁচে থাকতেই ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর সমস্ত টাকা তুলে নিয়ে অন্য ব্যাঙ্কে তাঁর নামে আমানত ক'রে দিয়েছিলেন। সুদে মূলে অনেক টাকা জমেছিল ব্যাঙ্কে। তারই কতকটা তুলে চন্দনলালের সঙ্গে মিলে একটি নূতন ব্যবসা পত্তন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। চন্দনলালের অমত ছিল না।

সুবিধা হয়ে গেল। তাঁর মেজ ভাইয়ের সঙ্গে স্থানীয় একজন জমিদারের বন্ধুত্ব ছিল। কলকাতায় ওর সঙ্গে পড়ত। তাঁর কলিয়ারির কাছেই জমিদারের জমিদারি। তাঁর ভাই প্রায়ই সেখানে যেত। জমিদারিতে কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় ছিল। বেড়াতে গিয়ে সেই পাহাড়ের মাটি দেখে তাতে বক্সাইট আছে ব'লে তাঁর ভাইয়ের সন্দেহ হ'ল। তারই পরামর্শে জমিদার একজন ভূতত্ত্বজ্ঞকে আনিয়ে মাটি পরীক্ষা করাল। সন্দেহ সত্যে পরিণত হ'ল। তাঁর ভাই সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ফল তাঁদের জানিয়ে দিল। তাঁরা অবিলম্বে জমিদারের সঙ্গে দেখা ক'রে মোটা সেলামি দিয়ে ও বাৎসরিক মোটা রয়েল্‌টি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাহাড়গুলো বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন, এবং সেই সঙ্গে কাছেই নদীর ধারে দু হাজার বিঘে জমি কিনে ফেললেন।

অ্যালুমিনিয়াম তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'ল সেই জায়গাতে। দ্বারোদ্ঘাটন করলেন লাট সাহেব। পাত্র-মিত্র-সমভিব্যাহারে এসেছিলেন। মাননীয় অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কলকাতা থেকে ফোটোগ্রাফার আনা হয়েছিল ছবি তোলার জন্য। সভা হয়েছিল। সভাতে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি। মহামান্য অতিথি-দের সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং তাঁরা যে বহু কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার ক'রে এতদূর এসে সামান্য একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা-দিবসটিকে তাঁদের উপস্থিতি দ্বারা ধন্য করেছেন—সেই জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং দেশের ধনী ব্যক্তিদের ঔদাসীন্য ও সংকীর্ণ-চিত্ততার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও দেশবাসীর দারিদ্র্য—এই সম্বন্ধে ক্ষোভসূচক বক্তৃতা করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের জন্যই যে ইংরেজ জাতি জগতের সভ্য জাতিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—এ কথা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। সর্বশেষ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—ভারতবর্ষ ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত না হ'লে দেশের দারিদ্র্য ঘুচবে না, দেশের অগ্রগতিও হবে না। দেশের স্বাধীনতাকামী নেতারা হয়তো কোন দিন দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করবেন, কিন্তু দারিদ্র্যের করাল দংষ্ট্রা থেকে দেশবাসীর মুক্তি যদি না ঘটে,

স্বাধীনতা অচিরে স্বাদহীন হয়ে উঠবে। লাট সাহেব তাঁর বক্তৃতা শুনে প্রীত হয়েছিলেন। সভাজনেরাও। বক্তৃতান্তে অনেকক্ষণ ধ'রে করতালি দিয়েছিল সবাই।

আর একটি ছবি। হৈমবতীর বাবার তৈরি বাংলোর বারান্দায় তোলা হয়েছিল।

তাঁর কলিয়ারিতে ও অ্যালুমিনিয়ামের কারখানাতে তিনি তাঁর গ্রামের ও গ্রামের পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের লোককে কাজ দিয়েছিলেন। তারা যোগ্যতা অনুসারে বেতন পেত। থাকবার জন্য বাড়িও পেয়েছিল পদমর্যাদা অনুযায়ী। কারও মনে কোন অসন্তোষ ছিল না। তাঁর নিজের ভাইদের ও ভগ্নীপতিকে তিনি মাসে মাসে মোটা মাইনে দিতেন। তাদের প্রত্যেকের বাসের জন্য মাঝারি গোছের সুন্দর বাংলো তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের এত বড় বাংলো ফাঁকা প'ড়ে থাকত। জন দুই মালী ও একজন গুর্খা দারোয়ান দেখাশুনো করত। বাংলোর বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের এক পাশে সারি সারি কয়েকটা ঘর ছিল। পাকা দেওয়াল ও মেঝে, টালির ছাউনি—চাকর-বাকরদের জন্য। দারোয়ান ও মালীরা তিনটে ঘরে থাকত। বাকি ঘরগুলার মধ্যে দুটো ঘর নিয়ে থাকত তাঁদেরই গ্রামের একটি যুবক। তাঁদের গ্রামেই বাড়ি। ছেলেটির বাবা গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও ছেলেবেলায় সেই

পাঠশালাতেই পড়েছিলেন। একবার গ্রামে গেলে পণ্ডিত মশায় তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর দু হাত ধ'রে ছেলেটির ভার নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। ছেলেটির বয়স তখন বছর দশ। পাঠশালার পড়া শেষ ক'রে পয়সার অভাবে আর পড়তে পারে নি। বাড়িতে ব'সে ছিল। তিনি ছেলেটির ভার নিয়েছিলেন। নিজের খরচে পড়িয়েছিলেন বি. এ. পর্যন্ত। দু-তিনবার চেষ্টা ক'রেও বি. এ. পাস করতে পারল না। কাজেই কলিয়ারিতে কেরানীর চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর বাংলোর কম্পাউণ্ডে বাস করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন—নরেন্দ্র গাঙুলী। একা থাকত না, তার স্ত্রীও তার কাছে থাকত। সুন্দরী রূপসী স্ত্রী। মেয়েটির নাম মণিমালা। বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। খুব গরিবের মেয়ে। তাঁদেরই গ্রামের মেয়ে।

বিশেষ কাজে কলিয়ারিতে গিয়েছিলেন তিনি। টাইফয়েড হ'ল। খবর পেয়ে ভ্রাতৃবধূরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। স্বামীর সঙ্গে রোজ দেখতে আসতেন তাঁরই দেওয়া মোটরে চ'ড়ে। কাছে থেকে সেবা করবার সুবিধা হ'ত না কারও। অনেকগুলি ক'রে ছেলে মেয়ে দুজনেরই। সংসারের ঝামেলাও বিস্তর। বোন তো আসতেই পারল না। আঁতুড়ে ঢুকতে হয়েছিল তখন। উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল নাকি তাঁকে সেবা

করবার জন্য। স্বামীর কাছে নিত্য তাঁর খবর পেয়ে কোনমতে ধৈর্য ধারণ করেছিল। ভগ্নীপতিকে রোজই আসতে হ'ত। তাঁরই চিকিৎসাধীনে ছিলেন।

এই সময়ে নরেন ও তার স্ত্রী প্রাণ দিয়ে সেবা করেছিল তাঁর। বিশেষ ক'রে নরেনের স্ত্রী মণিমালা। দিবারাত্র বিছানার পাশে থাকত, যন্ত্রণা লাঘব করবার চেষ্টা করত। সেরে উঠেছিলেন ওদেরই যত্নে সেবায়।

অসুখের সময়ে সেবা-যত্নের সুবিধার জন্য ওরা ওদের সংসার তাঁর বাংলোতেই তুলে এনেছিল। অসুখ থেকে উঠেও তিনি ওদের ফিরে যেতে দিলেন না। তারাও বিশেষ আপত্তি করল না। চাকর-বাকরদের সঙ্গে থাকতে ওদের অসুবিধে হ'ত। আত্মসম্মানেও বাধত। কিছু আর্থিক সুবিধা হ'ত ব'লে ওরা থাকত বাধ্য হয়ে। বাংলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মাসিক দু শো টাকা বরাদ্দ ছিল। সেটা নরেনই আপিস থেকে নিয়ে সকলকে মাইনে ও ভাতা দিত। বাকি যা থাকত তাতেই ওদের খাওয়া-খরচ চ'লে যেত। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা তাঁর সম্মতিক্রমেই হয়েছিল।

ধীরে ধীরে মেয়েটি নিজেকে জড়িয়ে ফেলল তাঁর সংসারকে ঘিরে। তাঁকেও। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, কাজ-কর্ম, বন্ধু-বান্ধব বা কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ওরই হুকুম

অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। বামুন, চাকর, ঝি সকলেই নতমস্তকে তার আদেশ পালন করতে লাগল। এই সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির কর্তৃত্ব তাঁরও ভাল লাগতে লাগল। মেয়েটির যৌবন-দীপ্ত দেহের আতপ্ত করস্পর্শে তাঁর অন্তরাকাশে ধীরে ধীরে অতি সূক্ষ্ম কামনার বাষ্প-জাল সঞ্চারিত হতে লাগল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে কল্পনা করতেন—এত টাকাকড়ি, ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি কিছু নাই। সামান্য মাইনের কেরানী। একটি নেহাত ছোট যেমন-তেমন বাড়িতে ওই মেয়েটিকে নিয়ে সংসার-পাতা। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় বাড়ি এসে ওর হাতের সেবা পাওয়া। তার পর সামান্য শয্যার 'পরে ওর পাশে রাত্রিযাপন। একটি কামনার ঢেউ তাঁর রোগ-দুর্বল দেহের উপরে গড়িয়ে যেত, মনে নেশার ঘোর লাগত।

মেয়েটিই ছবি তুলিয়েছিল। কাছাকাছি শহর থেকে ফোটোগ্রাফার আনিয়েছিল। বারান্দায় ছবি তোলা হয়েছিল। ছবিটিকে দেখলেন ভাল ক'রে। তিনি একটা ঈজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত। তাঁর মাথার কাছে ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির মুখে তৃপ্তির হাসি। জীবনে এই প্রথম ছবি তার। সাজগোজ করেছে যথাসম্ভব। সুতোর শাড়িখানি যথাসাধ্য

গুছিয়ে পরেছে। হাতে কয়েকগাছি ক'রে চুড়ি। আর কোন অলঙ্কার নেই। তবু স্নিগ্ধ হাসি ফুটে রয়েছে মুখটিতে। ওই হাসিটুকুই ধ'রে রাখতে চেয়েছিল মণিমালা চিরকালের জন্যে।

আর একটা পাতা ওল্টালেন।

হৈমবতী বহুদিন ধ'রে অকুণ্ঠিতভাবে তাঁর দেহ ও মন দিয়ে তাঁর সেবা করেছিলেন। তাঁর হৃদয় ও মন পরিতৃপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরের মধ্যে নারী-দেহ ও সঙ্গের প্রতি একটি দুরন্ত লোভ জন্ম নিয়েছিল ও ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল। হৈমবতীর মৃত্যুর পর সেই পশুটাকে তিনি শৃঙ্খলিত করেছিলেন। ভেবেছিলেন, হৈমবতীর স্মৃতি রোমন্থন ক'রেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু যখনই কোন যুবতী নারীর সান্নিধ্যে আসতেন, তখনই পশুটার ক্ষুধিত গর্জন ও দুর্দম চাঞ্চল্য সর্ব-চেতনা দিয়ে অনুভব করতেন।

মণিমালার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে সেই পশুটা অস্থির হয়ে উঠল। সবলে তাকে নিবৃত্ত করলেন। তবু মন এ কথা না ভেবে পারল না, মণিমালা সহজেই তাঁর স্ত্রী হতে পারত। তাঁর বয়স চল্লিশের খুব বেশি নয়। বয়সে এমন কিছু বেমানান হ'ত না। চেহারাতেও মণিমালা লম্বা-চওড়া দেখতে ছিল। ওর বেঁটে রোগা স্বামীর পাশে বরং তাকে মানাত না। অথচ তিনিই দেখে-শুনে ওকে নরেনের বউ ক'রে এনেছিলেন হৈমবতীর

মৃত্যুর কিছু আগেই। মণিমালা দেখতে লম্বা কাহিল ছিল তখন। ম্যালেরিয়ায় ভুগত খুব। রঙ এত ফরসা ছিল না। বিয়ের পর চাকরিস্থানে এসেই ওর চেহারার এত পরিবর্তন ঘটল। অনেকগুলি ছবি চোখে পড়ল একটির পর একটি। মণিমালার সঙ্গে তোলা। ভারতের নানা শহরে—নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে।

সম্পূর্ণ সেরে ওঠবার আগেই বর্ষা নামল। ডাক্তার বললেন, এ সময়টা কলকাতায় থাকাই ভাল। কলকাতা যাবার ব্যবস্থা হ্তে লাগল। মণিমালাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সঙ্কোচ হয়েছিল। তবে ওরা দুজনে চাকরদের সঙ্গে না থেকে বাংলোতেই থাকবে তার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। যাওয়ার আগের দিন মণিমালাই কথাটা পাড়ল, সেখানে কে দেখবে শুনবে আপনাকে ?

তিনি বিষাদ-ভরা কণ্ঠে জবাব দিলেন, কে আর আছে আমার ! যারা সত্যিকার আপনার তাদের ব্যবহার তো দেখলে ! দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, চাকর-বাকররা যতটা পারে দেখবে।

মণিমালা মিনিট কয়েক কি ভাবল, তার পর ব'লে ফেললে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

তিনি বললেন, নরেন কি রাজী হবে ?

রাজী হবে না কেন? বামুনটা যখন থেকেও যাচ্ছে, ওঁর খাওয়া-দাওয়ার কোনও কষ্ট হবে না। ওঁকে বলুন।

আমার বলাটা কি ভাল দেখাবে?

বলেছিলেন। নরেন রাজী হয়েছিল। ওর দুই সপ্তাহের ছুটির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ও সঙ্গে গিয়েছিল। ছুটিটা কলকাতায় কাটিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

কলকাতায় এলগিন রোডে একটা বাড়ি কিনেছিলেন মাস কয়েক আগে। বাড়িটা পূর্ববঙ্গের এক জমিদার বাস করবার জন্যে তৈরি করিয়েছিলেন। কণ্ট্রাক্টারের দেনা শোধ করবার জন্যে বাড়ি বিক্রি ক'রে দিতে হ'ল। বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে বেশ বড় দোতলা বাড়ি। সামনে ও পিছনে বাগান। হৈমবতীর সঙ্গে যে বাড়িতে বাস করতেন, সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নূতন-কেনা বাড়িতেই বাস করছিলেন। মণিমালাদের নিয়ে সেই বাড়িতেই উঠলেন।

কলকাতায় এসে তাঁর বাড়ি, গাড়ি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নানা সাজ-সরঞ্জাম, বিলাসের বিচিত্র উপকরণ, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল মণিমালা। পাড়াগাঁয়ে খড়ের চালওয়ালা মাটির ঘরে জন্মেছে, বড় হয়েছে। মোটা ভাত, মোটা কাপড়— এর বেশি জোটে নি কোনদিন। বিবাহিত জীবনেও এমন কিছু স্বাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে নি বা কোনদিন দেখবার আশা

করে নি। হঠাৎ এই অপরিমিত প্রাচুর্যের মধ্যে এসে সে দিশাহারা হয়ে যাবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? তবে চালাক মেয়ে। দু দিনেই সামলে নিয়েছিল। ঝি-চাকরদের কেউ তার মনের অবস্থা টের পায় নি। বরং তার চেহারা দেখে তাকে বড়লোকের মেয়ে ভেবে তাকে যথেষ্ট সমীহ করেছিল। সমস্ত সংসারের ভার তিনি তার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আয়রন-চেস্টের চাবি পর্যন্ত। মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটারে নিয়ে যেতেন তাকে। ফেরবার পথে বড় বিলিতী হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরতেন। বড় জুয়েলারের দোকানে নিয়ে গিয়ে ওর পছন্দমত এক সেট গয়না কিনে দিয়েছিলেন। দোকানের লোকটি এক জোড়া হীরে-বসানো ব্রেসলেট দেখাল। দাম বললে, দেড় হাজার টাকা। মণিমালার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, লোভে চকচক করছে। জিজ্ঞাসা করলেন, নেবে নাকি? মণিমালা মুখ লাল ক'রে চুপ ক'রে রইল। বললেন, পরে কিনে দেব। দিয়েছিলেন কিছুদিন পরেই।

নরেন মাঝে মাঝে মণিমালাকে নিয়ে যাবার কথা লিখছিল। মণিমালাই জবাব দিচ্ছিল। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সারে নি, যখন এসেই পড়েছে তখন শরীরটা সম্পূর্ণ সারলেই যাওয়া উচিত ইত্যাদি ব'লে স্বামীকে বুঝিয়ে চিঠি লিখছিল। মাস দুই পরে

নরেন কড়া তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখল তাঁকে, মণিমালাকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। মণিমালাকে চিঠিটা দেখালেন। প'ড়ে চুপ ক'রে রইল। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করবে ?

ও ম্লানমুখে বললে, যা বলবেন।

তিনি বললেন, স্বামী নিয়ে যেতে চাচ্ছে। তাঁর 'না' বলার কি অধিকার ?

মণিমালা মুখে কিছু বললে না। চকিতে একবার তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নীচু ক'রে কি ভাবতে লাগল।

তিনি মণিমালাকে আপাদ-মস্তক দেখে নিলেন। কলকাতায় এসে ওর রূপের জৌলুস অনেক বেড়েছিল। প্রচুর আরামে ও বিরামে থেকে ওর দেহের প্রতিটি অঙ্গ ভ'রে উঠেছিল; দেহ-সৌষ্ঠব দেহের কূল ছাপিয়ে উছলে পড়ছিল। মনটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। হাতের কাছে এমন জিনিস পেয়ে গ্রাস করবেন না কেন ? পরস্ত্রী ? হৈমবতীকে ভোগ করতে বিবেকে বাধে নি তো ? সধবা ? পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানীর স্ত্রীর সাধব্যের মূল্য কি ?

সেদিন রাত্রে হোটেলে খানা-পিনা সেরে বাড়ি ফিরে নেতিয়ে পড়লেন বিছানায়।

মণিমালা খবর পেয়ে ছুটে এল। ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে ?

মুখে জবাব না দিয়ে যন্ত্রণা-কাতর মুখে বুকে হাত দিয়ে অবস্থাটা জানালেন।

পাশে বসল মণিমালা; বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, ডাক্তারকে খবর দেব ?

বললেন, থাক্, হাত বুলিয়ে দাও, ওতেই ভাল হয়ে যাবে।

হঠাৎ বুকে ব্যথা হ'ল কেন ?—জিজ্ঞাসা করলে মণিমালা।

সারাদিন ভেবেছি তোমার যাওয়ার কথা। তুমি গেলে থাকতে পারব না।—শেষ দিকটা কণ্ঠ অশ্রুতে ভেঙে পড়ল।

মণিমালা বললে, বেশ তো, যাব না।

বললেন, কখনও যাবে না ? চিরদিনের মত থেকে যাবে আমার কাছে ?

মণিমালা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, আপনি যদি হাত পেতে চান তো আমার আপনাকে না-দেবার কিছুই নেই।

সত্যি ? ধীরে ধীরে ওর মুখখানি বুকের ওপর টেনে নিয়েছিলেন।

সেদিন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল মণিমালা।

নরেন এসেছিল মণিমালাকে নিতে। ও আসবার আগেই মণিমালাকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিলেন দিল্লী। দিল্লী থেকে বোম্বাই। শুধু বেড়াতে নয়, কাজও ছিল। আরও

অনেক জায়গা গিয়েছিলেন মণিমালাকে নিয়ে। শুধু সেবারে না। পরেও অনেকবার। ছবি তোলাতে হয়েছিল প্রত্যেকবার প্রত্যেক জায়গাতে। ছবি তোলার ভারি শখ ছিল মণিমালার।

নরেন ফিরে গিয়েছিল। মাস কয়েক পরেই কাজ ছেড়ে দিয়েছিল তাঁর কলিয়ারি থেকে। কোথায় চাকরি নিয়েছিল খবর নেন নি।

মণিমালাকে ভালবাসেন নি কোনদিন। হৈমবতীর মত মেয়ের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে, তাকে সম্পূর্ণরূপে পেয়েছে, অন্য মেয়েকে ভালবাসা তার পক্ষে অসম্ভব। মণিমালা তাঁর দেহের ক্ষুধা মিটিয়েছিল। মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে নি। মেটাবার সাধ্য ছিল না তার। হৈমবতী যে সুরে মনের তার বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল, সেখানে ঝঙ্কার তোলা পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত অমার্জিত মেয়ে মণিমালার সাধ্য ছিল না।

তবু মণিমালার অমর্যাদা করেন নি কোনদিন। তাঁর কাছে থাকলে কোনদিনও করতেন না। একদিন চ'লে গেল। স্বেচ্ছায় এসেছিল, স্বেচ্ছায় গেল। আসার সময়ে যেমন আপত্তি করেন নি, যাবার সময়েও প্রতিবাদ করলেন না।

কয়েকটি ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়ল। তিনি ও মণিমালা, মণিমালা ও চন্দনলাল—তিনজন একসঙ্গে কাশ্মীরে তোলা

হয়েছিল। পাশাপাশি কাশ্মীরের নানা স্থান ও নানা দৃশ্যের ছবি।

ব্যবসাসূত্রে চন্দনলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়লেন। ক্রমে ওর প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন প্রত্যেকটি কাজে। যুদ্ধ বাধল। পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ। ভারতেও সাজ্ সাজ্ রব প'ড়ে গেল। বিস্তর আমেরিকান সৈন্য বাংলা দেশে আড্ডা গাড়ল। সৈন্যদের ছাউনি তৈরি হতে লাগল বিস্তর। এরোড্রোমও। চন্দনলালের অনেক আত্মীয় বড় বড় কণ্ট্রাক্টর ছিল। তাদের সাহায্যে ছাউনি ও এরোড্রোম তৈরির কণ্ট্রাক্ট বাগালে। তিনিও যোগ দিলেন সঙ্গে। দু হাতে টাকা লুঠতে লাগলেন দুজনে।

চন্দনলাল প্রায় আসত তাঁর বাড়িতে। নানা ব্যাপার সম্বন্ধে পরামর্শ হ'ত ; নূতন নূতন মতলব আঁটা হ'ত। শুধু গল্প-গুজবও চলত কোন কোন দিন। সে সব দিনে মণিমালাকেও ডেকে আনা হ'ত। ওকে দেখলেই চন্দনলাল চঞ্চল হয়ে উঠত। তাঁর অলক্ষ্যে ঘন ঘন দৃষ্টিবাণ হানত মণিমালার ওপরে। মণিমালাও কসুর করত না। চন্দনলালের চেহারা মন্দ ছিল না। বয়সও কম—অন্তত তাঁর চেয়ে। তা ছাড়া তার অগাধ ঐশ্বর্যের গল্প ঠাকুর-চাকরদের কাছে অনেক শুনেছিল মণিমালা। কাজেই মণিমালার মন যে ক্রমে চন্দনলালের প্রতি

অনুকূল হয়ে উঠেছিল, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই. চন্দনলাল যে দিন আসত সেদিন বিশেষভাবে সাজসজ্জা করত মণিমালা। আসতে দেরি হ'লে চঞ্চল হয়ে উঠত। মাঝে মাঝে চন্দনলালকে কাজের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হ'ত। সে কদিন মণিমালার মনের অস্থিরতা কথা-বার্তায় হাবে-ভাবে ধরা পড়ে যেত। তিনিও বাইরে যেতেন মাঝে মাঝে। চন্দনলাল নিয়মিতভাবে মণিমালাকে সঙ্গদান করত—ফিরে এসে খবর পেতেন।

মণিমালা ও চন্দনলালের মধ্যে ধীরে ধীরে তাঁরই চোখের সামনে একটি প্রণয় গ'ড়ে উঠতে লাগল। তিনি বাধা দিলেন না। কাউকে দোষ দিলেন না। কারও দোষ ছিল না। চন্দনলাল বিবাহিত হ'লেও তার পত্নী চির-রুগ্না ছিল। স্বাস্থ্যবান স্বামীর দাবি মেটাবার শক্তি তাঁর রুগ্ন-দুর্বল দেহে ছিল না। মণিমালা ঐশ্বর্যের লোভে স্বামী ত্যাগ করেছিল। চন্দনলাল ঢের বেশি ঐশ্বর্যবান ছিল তাঁর চেয়ে। মনে কোন দুঃখও হ'ল না। দুঃখ কিসের জন্যে ? হৈমবতী তো তাঁর অন্তর ভ'রে ছিল সদা-সর্বদা। অন্তরের অন্দরমহলে সে তো সর্বদাই বিরাজ করছিল। মণিমালা, তারপর আরও অনেকে যারা তাঁর জীবনে এসেছে, সব দুদিনের অতিথি মাত্র। বাইরের বসবার ঘরে বসিয়েছেন তাদের। আমোদ-আহ্লাদ করেছেন

তাদের নিয়ে। দুদিন পরে বিদায় নিয়েছে তারা। হয়তো ক্ষণকালের জন্য মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। অন্দরে ফিরে হৈমবতীর সামনে গিয়ে অপরাধীর মত দাঁড়িয়েছেন। ক্ষমা-সুন্দর হাসি দিয়ে হৈম তাঁর সব অপরাধ, মনের সব গ্লানি ধুয়ে-মুছে দিয়েছে।

কাশ্মীর যাওয়া হ'ল সে বছর। ঝিলম নদীবক্ষে একই সঙ্গে একই বোটে সপ্তাহখানেক কাটিয়েছিলেন তিনজনে। ফিরতি-পথে আগ্রা ঘুরে এলেন। আগ্রা খুব ভাল লাগল মণিমালার। দিন কয়েক থাকতে চাইল। হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেলেন কলিয়ারি থেকে। ওদের রেখে চ'লে এলেন।

মাসখানেক পরে ফিরল ওরা। সব কাজের ভার নেবার জন্য অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখেছিল চন্দনলাল। তিনি সানন্দে নিয়েছিলেন। ফেরবার পর মণিমালা তাঁর কাছে ফিরল না। কলকাতায় ক্রীক রোয়ে চন্দনলালের নব-ক্রীত প্রাসাদোপম অট্টালিকায় চন্দনলালের হৃদয়েশ্বরীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হ'ল।

আর এক পৃষ্ঠা ওল্টালেন জগদীশপ্রসাদ। একটা ছবি চোখে পড়ল। বাংলার লাটসাহেব তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছেন। যুদ্ধে লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন, তারই বদলে এই সৌভাগ্য।

আর একটা ছবি। বিখ্যাত শ্রমিকনেতা নারায়ণচাঁদ, তিনি, কলিয়ারির জেনারেল ম্যানেজার, একজন কেরানী, জন

কয়েক কুলীর সর্দার। তিনি কি একটা কাগজে সই করছেন। সেই অবস্থায় ছবি তোলা হয়েছে। কেরানী ছোকরাটির উদ্যোগেই তোলা হয়েছিল। তাঁকে এক কপি উপহার দিয়েছিল। শ্রদ্ধা ক'রে নয়। যে প্রতিশ্রুতিপত্র তিনি সই করেছিলেন, তার যেন অবমাননা না করেন, সেইটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে। ছবিটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন জগদীশপ্রসাদ। ছোকরাটি বসেছে নীচে কুলীর সর্দারদের মাঝখানে। কাহিল বেঁটে চেহারা। চোখে চশমা। রঙটা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল ব'লে মনে পড়ল। চেহারাটা এমন কিছু সুশ্রী ছিল না, কিন্তু ধারাল ছিল। যেন ছোরার ফলা—তীক্ষ্ণধার, উজ্জ্বল। তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করত। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে সাধ্য হ'ত না। ওর কঠিন নৃশংস জিঘাংসা মনের উপর রূঢ় আঘাত করত। মনের মধ্যে নিঃসংশয় প্রত্যয় জন্মাত যে, একদিন এ একেবারে বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধবে।

১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে সম্ভবত তাঁর কলিয়ারিতে ধর্মঘট করল কুলীরা ঐ ছেলেটির—মানে ধীরেন বোসের প্ররোচনায়। কুলীদের ঘরগুলোতে বর্ষায় ছাদ থেকে জল পড়ত। দরজা-জানলা ভাল ছিল না। শীতের সময় খুব কষ্ট হ'ত তাদের। চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা ছিল না। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিত। অনেক

লোক মরত। সবই সত্য। কিন্তু এতদিন কুলীরা কোন আপত্তি করে নি। কোন দাবি-দাওয়াও করে নি। ছোকরাটি আফিসে কেরানী হয়ে ঢোকবার পর থেকেই গোলমাল শুরু হ'ল। কুলীরা বেশি মজুরি চাইতে লাগল। চাইতে লাগল— থাকবার জন্য ভাল ঘর, ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল, চিকিৎসার জন্য ভাল হাসপাতাল। সব কলিয়ারির কুলীরা দলবদ্ধ হ'ল। শ্রমিক-সংঘ গঠিত হ'ল। ধীরেন হ'ল শ্রমিক-সংঘের সম্পাদক। কুলীদের মধ্যে ওর প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগল। শেষে ওকে সবাই দেবতার মত ভক্তি করতে শুরু করলে। শ্রমিক-সংঘের তরফ থেকে তাঁর কাছে দাবি-পত্র পাঠাল ধীরেন। দশ দফা দাবি। দাবি অবিলম্বে না মেটালে ধর্মঘট শুরু হবে জানাল। তিনি সরজমীনে হাজির হয়ে ধীরেনকে ডেকে পাঠালেন। ভাল ক'রে বোঝালেন। নানা লোভ দেখালেন। হেডক্লার্ক ক'রে দেবেন, মাসে মোটা কমিশন প্রাপ্তির ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, আরও কত কি সুবিধা দেবেন বললেন। কোন কথায় কান দিল না সে। তিনি ওকে বিদায় ক'রে দিলেন। কিন্তু কিছুই করলেন না। কুলীরা ধর্মঘট শুরু করল। সব কাজ বন্ধ। যুদ্ধের বাজার তখন। দিন হাজার হাজার টাকা ক্ষতি হতে লাগল। ওদের সহানুভূতি জানিয়ে পাশাপাশি কলিয়ারির কুলীরা ধর্মঘট করল একদিন। শ্রমিক-নেতা

নারায়ণচাঁদ এসে জুটলেন দিন কয়েকের মধ্যে। আরও তাতিয়ে দিলেন সবাইকে। গতিক খারাপ দেখে মিটমাট করতে হ'ল শেষে। সব দাবি মেনে নিতে হ'ল। সকলের সামনে প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করলেন তিনি।

ধীরেনকে তিনি ক্ষমা করেন নি। ম্যানেজারকে ওর ওপর দৃষ্টি রাখতে ব'লে দিয়েছিলেন। ব'লে দিয়েছিলেন, ওর কাজে তিলমাত্র ত্রুটি দেখলেই যেন ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মাস ছয় পরে ছেলেটি তার মায়ের অসুখের জন্যে মাস-খানেকের ছুটি চাইলে। ম্যানেজার তাঁকে জানাতেই তিনি তাঁর বিশ্বস্ত একজন দারোয়ানের হাতে চিঠির জবাব দিলেন। সঙ্গে গেল তাঁর বেতনভোগী গুণ্ডা ধরমচাঁদ। ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন ছেলেটির। কিন্তু ধীরেন বাড়ি পৌঁছুতে পারে নি। ধরমচাঁদ তার ভার নিয়েছিল।

আর একটা ছবি। সাধারণ ছায়া-ছবি নয়। রঙিন ছবি। একটি চেয়ারে একজন গেরুয়াধারী সাধু ব'সে আছেন। মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি। পায়ে হরিণ-চামড়ার জুতো। লম্বা, একহারা চেহারা। ফরসা রঙ। বয়স পঞ্চাশের ওপরে। নীচে সাধুজীর তু পাশে ব'সে আছে মণিমালা ও চন্দনলাল। মণিমালার পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ। মুখে ভক্তি-নম্র ভাব। চন্দনলালও মুখে যথাসম্ভব ভক্তি ফোটাবার চেষ্টা করছে।

সাধুজীর নাম নিগমানন্দ স্বামী। অবাঙালী। মণিমালা সংগ্রহ করেছে তাঁকে। তীর্থে গিয়েছিল ও আর চন্দনলাল। চন্দনলাল নিজে থেকে যায় নি। মণিমালা টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। চন্দনলালের ফার্মের পরিচালনভার একরকম তাঁর হাতেই এসে গিয়েছিল। চন্দনলালের আপত্তির কারণ ছিল না কিছুই। অনেক দূর গিয়েছিল। হরিদ্বার, লছমনঝোলা, কংখল, বদরিকাশ্রম। ফিরে এল সাধুজীকে সঙ্গে ক'রে। মণিমালা ও চন্দনলাল দুজনই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

আর একটা ছবি। একটি দোতলা বাড়ির নীচতলার বারান্দায় একটি চৌকিতে যোগাসনে উপবিষ্ট স্বামী নিগমানন্দ। এঁড়েদহর কাছে গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়ি কেনা হ'ল মণিমালার নামে। স্বামীজীর আশ্রম হ'ল সেখানে। দোতলা বাড়ি। স্বামীজী জীবদ্দশায় বাস করবেন সেখানে। দেহ-রক্ষার পর শিষ্যা মণিমালা পাবে সব।

আর এক পৃষ্ঠা ওল্টালেন জগদীশপ্রসাদ। পাশাপাশি কয়েকটা ছবি। ১৯৪৩ সালের। সারা বাংলা জুড়ে দুর্ভিক্ষের আগুন জ্ব'লে উঠল দাউদাউ ক'রে। ত্রিশ লক্ষ লোক পুড়ে ম'রে গেল। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় অনশন-ক্লিষ্ট অস্থি-চর্মসার লোকদের ভিড় লেগে গেল। তাঁর বাড়ির সামনের ফুটপাথে চার-পাঁচটি পরিবার স্থায়ী আড্ডা পাতল। প্রতি

পরিবারে পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সাত-আট জন। তাদের তিনি খেতে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। হৈমবতীর কেনা সেই বাড়িটা ফাঁকা প'ড়ে ছিল। সেখানে একতলার ঘরগুলোতে তাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। তাদেরই কয়েকটা ছবি তুলেছিলেন তিনি।

আর একটা ছবি। সারি সারি বহু লোক খেতে বসেছে। থালা হাতে পরিবেশন করছে—মণিমালা ও চন্দনলাল। ছুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের খাওয়াবার জন্যে ফ্রী কীচেন করল মণিমালা। চন্দনলালের গুদাম ছিল বড়বাজারে। বেশ বড় তেতলা বাড়ি। নীচের তলার উঠনটা বেশ লম্বা-চওড়া। সেইখানেই ব্যবস্থা হ'ল। দিন চার-পাঁচ শো লোক খেত। মাসখানেক ধ'রে চালিয়েছিল। যে দিন খোলা হ'ল স্বামীজী এসেছিলেন। তিনিও গিয়েছিলেন। ছবি তোলা হ'ল। পাশেই আর একটা ছবিতে স্বামীজী, তিনি, চন্দনলাল ও মণিমালা।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে একটা চিঠি পেয়েছিলেন। মণিমালার শ্বশুর, তাঁর ভূতপূর্ব পণ্ডিত মশায়ের চিঠি। তাঁকে লিখেছিলেন। চিঠির বক্তব্য ছিল এই—তাঁর একমাত্র পুত্র নরেন যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছে। বেঁচে আছে কি না জানেন না। অত্যন্ত আর্থিক কষ্টে পড়েছেন।

বৃদ্ধ হয়েছেন। কাজ করবার ক্ষমতা নেই। তার উপরে স্ত্রী অন্ধ। কি কষ্টে দিন চলছে ভগবান জানেন। সর্বশেষে ভূতপূর্ব কৃতী ছাত্র, গ্রামের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানের কাছে অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

দু শো টাকা পাঠিয়েছিলেন পরদিনই। ছেলেটা যুদ্ধে গেল কেন? সুন্দরী স্ত্রী হারানোর দুঃখে? মণিমালার মত মেয়েকে পেয়ে হারানোর দুঃখ স্বাভাবিক। তাঁর নিজেরও দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ? একটা মেয়েমানুষ জীবনের চেয়ে বড়? মূর্খ! তার চেয়ে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলে মানুষ হয়ে যেত। মণিমালার মূল্যস্বরূপ তাকে একটা কলিয়ারির রেজিং কণ্ট্রাক্ট দিতে চেয়েছিলেন। করলে বড়লোক হয়ে যেত এতদিনে। মণিমালার মত কত মেয়ে ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। ওর আত্মসম্মানে নাকি আঘাত লেগেছিল! গরিবের আত্মসম্মান! টেকোর তেড়ির সাধ!

সে বছর পূজোয় অনেক দিনের পর বাড়ি গিয়েছিলেন। পণ্ডিতমশায় ও তাঁর স্ত্রীর জন্যে ধুতি শাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। বিজয়ার প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। ধুতি শাড়ি মিষ্টি ও নগদ দু শো টাকা প্রণামী দিয়েছিলেন। অজস্র আশীর্বাদ করলেন দুজনে। নরেনের মা ছেলের জন্যে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, কি যে দুর্মতি হ'ল! বেশ চাকরি করছিল তোমার কাছে।

বউটার দুঃখে বিবাগী হয়ে গেল বাছা! বুকটা ধক্ ক'রে উঠল শুনে। মাথাটা হেঁট হয়ে আসতে লাগল লজ্জায়। পণ্ডিতমশায় দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, সবই ভাগ্যের ফের বাবা। না হ'লে কলকাতার মত শহরে তোমার মত লোকের বাড়িতে থেকে কলেরায় মারা যায়! বিস্মিত হলেন কথা শুনে। মণিমালার সত্য খবর নরেন কাউকে বলে নি! বুদ্ধির প্রশংসা করলেন ওর।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। এইবারেই পূজোর পর গ্রামের জমিদার-বাড়ি থেকে ডাক পড়ল। জমিদারবাবু মারা গিয়েছিলেন অনেক দিন। তাঁর একমাত্র পুত্রও মারা গিয়েছিলেন বছর কয়েক আগে। জমিদারবাবুর সন্তানহীনা বিধবা পুত্রবধূই জমিদারির মালিক। কলকাতার মেয়ে। কলকাতায় তার বাবার কাছেই থাকত। পুরনো গোমস্তা সম্পত্তি দেখাশুনো করতেন। বধূ বৎসরে একবার পূজোর সময় গ্রামে আসত। বাড়িতে দুর্গোৎসব হ'ত। প্রাচীন পূজা। বংশানুক্রমিক ভাবে বহু বৎসর ধ'রে হয়ে আসছে। বংশের প্রতিনিধির পূজোর সময়ে উপস্থিত থাকাই নিয়ম। নিয়ম পালন না করলে অমঙ্গল হয়। অবশ্য মেয়েটার অমঙ্গলের বাকি ছিল না কিছু। শ্বশুরবাড়ির দিক তো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বাপের বাড়ির দিকও তাই। মা, একমাত্র

বড় ভাই—দু-ই মারা গিয়েছিলেন। বেঁচে ছিলেন শুধু বৃদ্ধ বাবা। তাঁরই মঙ্গলার্থে নিয়ম রক্ষা করবার জন্যে পূজোয় যোগ দিত।

উনি দেখা করেছিলেন। গোমস্তা খাতির ক'রে একেবারে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বসাল। আশা করেছিলেন, বধূ পর্দার আড়াল থেকে গোমস্তার মারফত বক্তব্য জানাবে। তা না ক'রে নিজেই ঘরের ভিতর এসে সামনে দাঁড়াল। মেয়েটির সপ্রতিভতায় একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু আরও বিস্মিত, এমন কি চমৎকৃত হয়েছিলেন, ওর দেহের প্রচুর স্বাস্থ্য, যৌবন ও রূপ দেখে। ধবধবে ফরসা রঙ। পরেছিল নরুনপাড় ধুতি, সাদা সাধারণ একখানা ব্লাউজ। মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। মনে হ'ল যেন শুভ্রবসনাবৃতা নিপুণ-শিল্পীর হাতে তৈরি সরস্বতীর মূর্তি। মেয়েটিকে দেখেই তিনি সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মেয়েটি একবার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে বললে, আপনি বসুন।

তার পর ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে বক্তব্য বললে। জমিদারী বিক্রি ক'রে দিতে চায়। বাবা তার শয্যাশায়ী। তাঁর কাছ ছেড়ে এক মুহূর্ত কোথাও আসা অসাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করলে জমিদার-বংশের যা যা করণীয় তা তাঁকে করতে হবে। পুরানো কর্মচারীদের বরখাস্ত করা চলবে না।

জমিদারি কিনবার ইচ্ছা ছিল না। তবু মেয়েটির অনুরোধ

রক্ষা করবার জন্যে কিনেছিলেন। অবশ্য সুবিধা হয়েছিল এতে। গ্রামের জন্যে একটা কিছু করবার তাঁর অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল। জমিদার-বাড়িটা হাতে আসাতে সুযোগ পেলেন। গ্রামে একটা হাই-স্কুল স্থাপন করলেন তাঁর মায়ের নামে। কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যামন্দির। বাড়িটা মেরামত করিয়ে, একটু অদল-বদল করিয়ে স্কুলের জন্যে ব্যবহার করলেন।

মেয়েটি তাঁর মনে বেশ দোলা দিয়েছিল। এত রূপ যৌবন নিয়ে মেয়েটি জীবনের সব সুখ, সব আনন্দ, সব সাধ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত রইল! জীবনের আনন্দমেলায় দু দিনেই খেলা শেষ ক'রে একান্তে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইল! সামাজিক বিধিনিষেধের লৌহ-জালের ঘেরার মধ্যে সুন্দর ফুলের মত ফুটেই থাকবে! ভ্রমর কোনদিন ওর কানে গুঞ্জন করবে না, ওর মধু পান ক'রে ওকে সার্থক করবে না? দেখতে দেখতে ওর সৌন্দর্য ম্লান হয়ে আসবে, লাবণ্য উবে যাবে, মধু শুকিয়ে যাবে; তার পর একদিন শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে গিয়ে ঝ'রে পড়বে। জীবনবৃন্তে ওর স্থানটুকু একেবারে খালি থেকে যাবে।

সত্যি দুঃখ হয়েছিল মেয়েটির জন্যে। তা ছাড়া ওঁর অন্তরের সেই লোভী পশুটার চোখ দুটো লোভে চকচক ক'রে উঠেছিল। লালা ক্ষরণ হয়েছিল লোলজিহ্বা থেকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে নি। তার পরদিনই দেখা করতে

গিয়েছিলেন, জমিদারি কিনতে রাজী—এই কথা জানাবার জন্যে। ভেবেছিলেন, আবার দেখা হবে, আর কিছু না হোক, কৃতজ্ঞতা-কোমল কৃষ্ণায়ত চোখ দুটির এক ঝলক দৃষ্টি অন্তত লাভ হবে। মেয়েটি দেখা করে নি। গোমস্তা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল জমিদার-বধূর তরফ থেকে।

মেয়েটিকে বৎসর তিন পরে দেখেছিলেন। কলকাতার কোন ধনী ব্যবসায়ীর কন্যার বিবাহ-মণ্ডপে। জনৈক লীগ-মন্ত্রীর সঙ্গিনী হিসাবে। বেশ-ভূষায় বৈধব্যের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না। তিনি দূর থেকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন। মেয়েটি একবার তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। চোখোচোখি হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথা অনিবার্যভাবে মনে পড়ল। প্রায় প্রতিদিন মনে পড়ে। হৈমর মত তাঁর মনের আকাশে সেও স্থায়ী স্থান পেয়েছে। উদয়াস্তের নিয়মে বাঁধা পড়েছে। অন্নপূর্ণা। জমিদারবাবুর মেয়ে। তাঁর সঙ্গে যার বিয়ের কথা হয়েছিল। বিয়ে হয়েছিল তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি একটি গ্রামের এক অবস্থাপন্ন পরিবারে। বিয়ের বছর তিন পরেই স্বামী মারা গেল। শ্বশুর ছিলেন বেঁচে। তিনি কন্যার মত স্নেহ ও আদরে তাকে সংসারে রাখলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর ছোট জাদের সঙ্গে বনল না। তাকে পদে পদে অপমান করতে

লাগল। দেওররা প্রতিকার তো করলই না, বরং নিজের নিজের স্ত্রীদের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করতে লাগল। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে পালিয়ে আসতে হ'ল শেষে। বাপের জমিদারি তখন বিক্রি হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে একদিন অন্নপূর্ণা অন্নের জন্যে তাঁর কাছে এসে হাজির হ'ল। তিনি সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

জগদীশপ্রসাদ চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুলেন। অ্যালবামে ওর কোন ছবি নেই। ওর ছবি উনি তুলতে পারেন নি। ও তুলতে দেয় নি। মনের পটেও ও আজ ধরা দিল না। তবু মনে পড়ল, যেদিন সে ভিখারিনীর বেশে মুষ্টি-ভিক্ষার জন্যে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। শীর্ণ মলিন দেহ। ম্লান মুখ। চোখে করুণ অসহায় দৃষ্টি। পরনে মলিন বিধবার বেশ। দু হাত বুকে চেপে আনত মুখে দাঁড়াল। মুখে কিছু বলল না। দু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। গোমস্তাবাবু আগেই ওর সম্বন্ধে তাঁকে সব জানিয়েছিলেন। তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। ওকে সাদরে সংসারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গৃহকর্ত্রীর শূন্য আসনটিতে বসিয়ে দিলেন।

যে ঘরে হৈমবতীর ছবি ছিল সে ঘরে গিয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, ইনি কে? তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন। ও সবই শুনেছিল বোধ হয় আগেই। ব'লে উঠল, ও, ইনিই! অর্থাৎ

ওঁর জন্যেই তাঁর জীবনের মধ্যে ও আসতে পারল না। আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিল। তার পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

অন্নপূর্ণাকে কোনদিন তাঁর দেহ ও মন কামনা করে নি। কিছুদিনের মধ্যেই ওর দেহ পুষ্ট ও তাজা হ'ল, সৌন্দর্য ও লাবণ্য ফিরে এল, হাবে-ভাবে প্রফুল্লতা জেগে উঠল, ব্যবহার সহজ আত্মীয়তায় সরস হয়ে উঠল। তবু যথাসম্ভব ওকে দূরে দূরেই রাখতেন। খাবার সময়ে ও কাছে ব'সে যত্ন ক'রে খাওয়াত। চাকর থাকা সত্ত্বেও ওঁর শয্যা রচনা ক'রে দিত নিজের হাতে। কাজের ভিড়ে রাত্রি বেশি হয়ে গেলে এসে জোর ক'রে শুতে পাঠাত। আরও নানা বিষয়ে খবরদারি করত। তিনি উপকৃতার কৃতজ্ঞতার প্রকাশ নীরবে ও নির্বিকারভাবে গ্রহণ করতেন।

এই সময়ে কয়েক জন উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁদের অনুগ্রহে ও সাহায্যে কয়েকটা বড় কাজ পেয়ে গেলেন। সপ্তাহে একবার ক'রে ওদের কলকাতার নামজাদা বিলিতী হোটেলে ভোজ দিতেন। একদিন রাত্রে মত্তাবস্থায় বাড়ি ফিরেছিলেন। অন্নপূর্ণাই ধ'রে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল তাঁকে। সকালে চোখ মেলে তাকিয়েই চমকে উঠলেন, অন্নপূর্ণা তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

অন্নপূর্ণা সুখী হয়েছিল। বলেছিল, ছেলেবেলা থেকে তাঁকে

দেখে তার ভাল লেগেছিল। তাঁর সঙ্গে তার যখন বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, তার আনন্দের সীমা ছিল না। যখন বিয়ে হবে না শুনল, আড়ালে কেঁদেছিল। তাঁকে ও কোনদিন ভুলতে পারে নি। তাঁকে আবার পেয়ে ওর দেহ ও মন পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

মত্তাবস্থায় দুষ্কৃতির জন্য তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন, অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন। সে তাঁকে নিরস্ত ক'রে বলেছিল, তোমার তো কোন দোষ নেই। আমি নিজে থেকে ধরা দিয়েছিলাম। আর একদিন বলেছিল, এ আমার হঠাৎ পাওয়া নয়। অনেক দিনের পাওনা বাকি পড়েছিল। সুদে-আসলে আদায় ক'রে নিচ্ছি।

এত সুখ সইল না ভগবানের। হঠাৎ মুখে একটা সাদা দাগ দেখা দিল অন্নপূর্ণার। ডাক্তার এসে বললেন, কুষ্ঠ। আরম্ভ হয়েছে মাত্র। অন্নপূর্ণা আর্তনাদ ক'রে উঠল, কুষ্ঠ! বলেন কি ডাক্তারবাবু! এর চেয়ে যে মৃত্যু ভাল! ডাক্তার-বাবু সাহস দিলেন। প্রথম অবস্থা; এখন থেকে রীতিমত চিকিৎসা হ'লে সেরে যাবে—আশা দিলেন। কিন্তু অন্নপূর্ণা সেই যে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল, উঠল না সারা দিন। তিনিও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। মুখে নয়, পাশে ব'সে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে। ও হাত ছুঁড়ে দিয়ে কান্না-ভরা করুণ ক্ষুব্ধস্বরে

বলেছিল, আমার কাছে এসো না, আমাকে ছুঁয়ো না—স'রে যাও এখান থেকে। এ ঘরের বাতাসে আমার রোগের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। এসো না এ ঘরে। চ'লে যাও।—একটানা ব'লে হাঁপাতে লাগল অন্নপূর্ণা। ওর কথা শুনে সত্যি ভয় পেয়েছিলেন। ঘর থেকে চ'লে এসেছিলেন তখনই।

রাত্রে আর নিজে খবর নেন নি। চাকরের মারফত খবর নিয়েছিলেন। সারা দিন খায় নি অন্নপূর্ণা। রাত্রেও না-খেয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েছিল। সকালে দরজা খুলল না অনেক বেলা অবধি। দরজা ভাঙা হ'ল। সভয়ে দেখলেন, অন্নপূর্ণার মৃতদেহ কড়ি থেকে ঝুলছে। তার বীভৎস বিকৃত চেহারা দেখে তিনি ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন। বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেন নি। পালিয়ে এসেছিলেন নিজের শয়নকক্ষে। চাকররা মৃতদেহ নামিয়েছিল। আপিসের কর্মচারীরা এসে সৎকার করেছিল। মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময়ে তিনি একবার বার হয়েছিলেন।

অন্নপূর্ণার শোচনীয় আকস্মিক মৃত্যু তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। দুর্ভাগিনীর দেহের ও মনের দারুণ ক্ষুধার পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন। ভাগ্যবিধাতা যে সুধাপাত্র তার মুখের সামনে সহসা ধরেছিলেন, তা সে নিঃশেষে পান করবে—এই ছিল তার হৃদয়ের একান্ত কামনা। কতদিন মুখ ফুটে বলত,

যদি ভাল না লাগে, তাড়িয়ে দিও না, বুঝলে। একটু ম্লান হেসে বলত, তাড়িয়ে দিলেও আবার এসে ঘরে ঢুকব। একদিন বলেছিল, যদি ম'রে যাই হঠাৎ, তা হ'লেও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, তোমার কাছে কাছেই থাকব।

অন্নপূর্ণার মৃত্যুর পর এই কথাটা প্রায় মনে পড়ত। রাত্রে অনেক দিন একা শুতে পারেন নি। একজন চাকর ঘরে থাকত। তবু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত কোন-কোনদিন। মৃতা অন্নপূর্ণার সেই বিকৃত বীভৎস মূর্তি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠত। মনে হ'ত, সহসা-মুক্ত রুদ্ধ জলস্রোতের মত যে প্রচণ্ড আবেগে অন্নপূর্ণা তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত, যে তীব্র আগ্রহে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির ক'রে তুলত, ওর সেই ভয়াল মূর্তি নিয়ে ও যদি তেমনই ক'রে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনই ক'রে তাঁকে হিম-শীতল আলিঙ্গনে বেঁধে চুম্বন করে? একটা বরফের মত শীতল স্পর্শ তাঁর দেহের রক্তকে জমাট ক'রে তুলত, একটা ভারী পাথর যেন বুকের উপর চেপে ব'সে দম বন্ধ ক'রে আনত। বিছানার উপর উঠে বসতেন। বেড-সুইচ টিপে ঘরের সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল আলোটা জ্বালতেন। চাকরটাকে ডেকে জাগিয়ে দিতেন। বিছানা থেকে নেমে, জানলার কাছে গিয়ে বুকভরে বাইরের মুক্তবায়ু নিশ্বাস নিতেন। তার পর হৈমবতীর ছবির নীচে দাঁড়িয়ে ওর

মুখের পানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অভয় সংগ্রহ করতেন। তার পর শয্যায় ফিরে আসতেন।

মনে পড়ল, এই সময়ে একদিন হৈমবতীকে স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনি। পাশে এসে ব'সে ছিল যেন। বলছিল, কুকুরের মত হ্যাংলা মেয়েটাকে আমিই তাড়িয়ে দিয়েছি। আমার জিনিসে মুখ দেয়—এত সাহস!

অন্নপূর্ণার মৃত্যু তাঁর জীবনের ভিত্তিকে রূঢ় আঘাতে শিথিল ক'রে দিয়েছে। তার পর থেকে প্রায়ই মনে হয়, জীবন-পাত্রের সুধা ফুরিয়ে যাবার আগেই যদি পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে যেতে হয়! যদি অন্নপূর্ণার মত ঘৃণিত রোগের আক্রমণ হয় দেহে? বাঁচা অসম্ভব হয়ে ওঠে? মাঝে মাঝে দু হাতের আঙুল প্রসারিত ক'রে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে দেখেন। গায়ের এখানে সেখানে চিমটি কাটেন, কোন একটা কিছু দাগ দেখলেই সূচ ফুটিয়ে সংজ্ঞা আছে কি না পরীক্ষা করেন। স্নানের ঘরে লম্বা আয়নার সামনে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে সারা দেহটাকে পরীক্ষা করেন। কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেও শেষ-বিদায়ের সতর্ক ধ্বনি হঠাৎ কানে এসে তাঁর মনকে চঞ্চল ক'রে দেয়।

আর এক পৃষ্ঠা ওল্টালেন জগদীশপ্রসাদ। প্রথম ছবিটিতে চোখ পড়ল। হৈম-মন্দির প্রতিষ্ঠা-দিবসের ছবি। হৈমবতীর

সেই ছোট বাড়িতে কয়েকটি দুর্গত পরিবারকে স্থান দিয়েছিলেন। তারা প্রায় সবাই শিল্পী। তাঁতী, সূত্রধর ও কর্মকার। তাদের এতদিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। হঠাৎ একদিন হৈমবতীর সেই কথাটা মনে হ'ল—আমাকে এমনই অমর ক'রে রাখতে পারবে না? হঠাৎ অনুশোচনার সঙ্গে মনে হ'ল, হৈমবতী সর্বস্ব দিয়ে গেছে তাঁকে, অথচ তার স্মৃতিরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন নি তিনি। কি করা যাবে, ভাবতে গিয়ে হৈমবতীর সেই প্রিয় বাড়ি ও সঙ্গে সঙ্গে আশ্রিত ওই লোকগুলির কথা মনে হ'ল। ভাবলেন, ওদের নিয়ে কিছু একটা করবেন। বাড়িটার পাশেই অনেকখানি জায়গা আগেই কেনা ছিল। সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন দুর্গত শিল্পীদের জন্য শিল্পভবন। আটটি পরিবারের লোক নিয়ে শুরু করলেন। জায়গাটা ঘিরে প্রাচীর তোলা হ'ল। সামনে হ'ল ফটক। ফটকের মাথায় সিমেণ্ট-জমানো প্রস্তরফলকে লেখা হ'ল 'হৈম-মন্দির'। ভিতরে সারি সারি ঘর তৈরি হ'ল। বিভিন্ন শিল্পীদের কর্মশালা। তাঁত বসল। কর্মকারের জন্য হাপরের ব্যবস্থা হ'ল। মেয়েদের জন্য চরকা-ঘর তৈরি হ'ল। নানা রকমের কর্মীর জন্য নানা রকমের কর্ম-ব্যবস্থা হ'ল। এক পাশে রান্নাঘর, খাবার ঘর। মেয়েদের ওপর রান্নার ভার। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপরেও নানা কাজের ভার দেওয়া

হ'ল। কর্ম-মন্দিরে তৈরী জিনিসগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও হ'ল। কাজ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য একজন অধ্যক্ষ ও কয়েক-জন কর্মচারী নিযুক্ত হ'ল। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি সমস্ত কর্মীদের মূলধন দিলেন এক লক্ষ টাকা। এই টাকাতে কাঁচা মাল কেনা হবে। প্রস্তুত জিনিসপত্র বিক্রয় ক'রে যা আয় হবে তাতে সকলের খাওয়া-দাওয়ার খরচ চালিয়ে লভ্যাংশ সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন ক'রে দেওয়া হবে। অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ল চাটগাঁর একটি বিপ্লবী যুবক। নাম অমিতাভ। কারাদণ্ড হয়েছিল তার। মুক্তি পেয়ে তাঁর কাছে ঘোরাঘুরি করছিল চাকরির জন্য। লম্বা-চওড়া শক্তিমান চেহারা। চরিত্র-বান, কর্মনিষ্ঠ, সৎ। ওর ওপরে হৈম-মন্দির গ'ড়ে তোলার ভার দিলেন।

প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন বাংলার লাটসাহেব। তার ছবি রয়েছে। কলকাতার অনেক গণ্য-মান্য ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। চন্দনলাল এসেছিল। একটা সভার আয়োজন হয়েছিল। সভামধ্যে তিনি বাংলার মৃতপ্রায় কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে সারগর্ভ তথ্যবহুল বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতা দেওয়ার সময়ের তাঁর ছবি রয়েছে। গভর্নরের পাশেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আশেপাশে নিমন্ত্রিত মাননীয় অতিথিবৃন্দ। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে অমিতাভ। এই সভাতে তিনি যুদ্ধের

স্বেচ্ছাসেবিকাদের পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য একটি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিয়েছিলেন লাটসাহেবের হাতে। সেই অবস্থার একটি ছবি রয়েছে। একটি রূপার প্লেটে চেকটি রেখে তিনি লাটসাহেবের সামনে সসম্মানে ধরেছেন। লাটসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে সেটি নিচ্ছেন। আর একটি ছবিতে লাটসাহেব তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছেন।

এক পাশে একটি ছবির উপরে দৃষ্টি পড়ল। একটি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের যুবতী মেয়ে। পাতলা ছিপছিপে! মুখখানি ঢলঢলে। টানা টানা চোখ। কোঁকড়া চুলগুলি কাঁধে ঘাড়ের পাশে গালের ওপরেও পড়েছে। পরেছে সাদা সাধারণ শাড়ি। আঁচলটি বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে কোমরে জড়িয়েছে। ব্লাউজের হাতায় স্থচে-তোলা ফুল ও পাতাগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পায়ে স্যাণ্ডাল। একটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটি হাত আলগাভাবে বুকের উপরে রেখেছে। অধরোষ্ঠে এক ফোঁটা মধুর হাসি জমাট হয়ে রয়েছে।

সব কথা মনে পড়ল। চন্দনলাল মণিমালার নামে ডায়মণ্ড-হারবারের কাছে বিস্তর জমি কিনল। একটা বাগান কিনল। সেখানে একতলা বাংলো তৈরি করাল। নাম দিল 'মণিচন্দন লজ'। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মণিমালার মন থেকে পাড়াগাঁয়ের অবারিত নীল আকাশের নীচে, সবুজ গাছ-পালা ঝোপ-ঝাপের

মাঝখানে খোলা হাওয়ায় সহজ সরল জীবনযাপনের লোভ যায় নি। সে মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে একটানা শহরবাসের গ্লানি কাটিয়ে আসত।

'মণিচন্দন লজে' মিলিটারী অফিসারদের একটা ভোজ দিল চন্দনলাল। তার বন্ধুবান্ধব আর অনেক ব্যবসাদারকে নিমন্ত্রণ করল। খানা-পিনার ব্যবস্থা হ'ল কলকাতার বিলিতী হোটেল থেকে। মিলিটারী আমেরিকান সাহেবদের চিত্তানুরঞ্জনের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করল চন্দনলাল। কয়েকটি মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রঘরের যুবতী মেয়ে সংগ্রহ ক'রে আনল তারই ফার্মের দুজন বাঙালী কর্মচারী। প্রত্যেককে এক রাত্রির জন্য এক শো টাকা ক'রে নাকি দিয়েছিল। মেয়েগুলির চেহারা মনে পড়ল। পরনে সস্তা সুতির রঙিন শাড়ি, সস্তা ছিটের ব্লাউজ, পরিপাটি ক'রে চুল বেঁধেছিল। মুখে পাউডারের প্রলেপ। পায়ে জুতো। সাজ-সজ্জার আবরণ ভেদ ক'রে ওদের অস্থিচর্ম-সার দেহ আত্মপ্রচার করছিল। ওদের শীর্ণ মুখে, কোটরগত চোখে, ওদের চোখের দৃষ্টিতে, বহুদিনব্যাপী অর্ধাশন জ্বলজ্বল করছিল। দুর্ভিক্ষের অগ্নিময় অঙ্গুলি-স্পর্শে ওদের মান-সম্ভ্রম, নীতিবোধ, ভাবী জীবনে প্রেম ও প্রীতি ভরা সংসারের স্বপ্ন—সবই পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছিল।

যে মেয়েটি তাঁকে সঙ্গদান করেছিল, তারই ছবি। মেয়েটির

নাম—শেফালিকা। নাম জিজ্ঞাসা করতেই বলেছিল, অতবড় নাম ব'লে ডাকতে হবে না আপনাকে। বলুন, শিউলি। তাঁর বাহুতে ধ'রে নাড়া দিয়ে বলেছিল, বলুন না, নাম ধ'রে ডাকুন না একবার। মুখে ফোস্কা পড়বে না। বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ের কাছে প্রথম আলাপেই এতটা ঘনিষ্ঠতা আশা করেন নি। বুঝলেন, ব্যবসায়ে নূতন নামে নি। অনেক আসরে মুজরো করা হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। ফেরবার সময়ে তাঁরই গাড়িতে এল মেয়েটি। প্রশস্ত পিচের রাস্তা। দু ধারে জলাভূমি, মাঠ, ছোট ছোট গ্রাম। অন্ধকার রাত্রি। মেয়েটি তাঁর গা ঘেঁষে বসেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে কে আছে তোমার? বললে, বুড়ো বাবা, দুটি ভাইবোন। বাবা পোস্টাফিসে চাকরি করতেন। পঞ্চাশটি টাকা পেনশন পান। এক মণ চালের দাম মাত্র। ভাই-বোন দুটি স্কুলে পড়ে। সংসারের সব ভার আমার ওপরে। প্রশ্ন করলেন, কি চাকরি কর? চাকরির নাম করল। বললে, দিনের বেলায় চাকরি করি সারা দিন, রাত্রে সুবিধে সুযোগ হ'লে যা করি দেখতেই তো পেলেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টভাবে বললে কথাগুলি। হঠাৎ খকখক ক'রে কাশতে লাগল মেয়েটি। রুমাল মুখে চেপে কাশি চাপবার চেষ্টা করতে লাগল। বললেন, কাশছ কেন এত? মেয়েটি জবাব দিল না। কাশি থামলে রুমালটা তাঁর

মুখের সামনে ধ'রে বললে, দেখছেন! রক্ত! কাশির সময় রক্ত বেরোয় আমার। যক্ষ্মা হয়েছে কিনা! গভীর ক্লান্তিতে তাঁর বুকের উপর হেলে পড়ল। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। যক্ষ্মা হয়েছে! বলে কি! ইচ্ছে হ'ল, ছুঁড়ে ফেলে দেন মেয়েটাকে। সবলে ইচ্ছা দমন করলেন। মেয়েটা ধীরে ধীরে মিহি গলায় বলতে লাগল, শুধু কি তাই! খারাপ রোগ হয়েছে। ডাক্তার বলেছে। এবার রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আর্তকণ্ঠে বললেন, সত্যি! কখন থেকে? মেয়েটা বললে, মাস ছয় হ'ল। ব'লে তাঁর বুকে মুখ রেখে হাঁপাতে লাগল। নারী-দেহের আতপ্ত স্পর্শে তাঁর দেহের রক্ত গরম হয়ে উঠবে কি, ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। স্থির বিশ্বাস হ'ল যে, এ রোগের বিষ ওই মেয়েটার দেহে ঢুকেছে, নিশ্চয় তাঁর দেহেও সংক্রামিত হয়েছে। ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর কি হবে ভাবতে মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। মেয়েটা মুখটা তাঁর গালের ওপর রেখে বললে, আপনার গালটি বেশ ঠাণ্ডা! ব'লে গালে গাল রেখে নির্জীবের মত ব'সে রইল। শুধু কুৎসিত রোগ ধরিয়ে ছাড়ল না মেয়েটা; যক্ষ্মাও ধরিয়ে তবে ছাড়বে। মেয়েটার উপর রাগে তাঁর সারা মন জ্বলতে লাগল, কিন্তু ওর নাকের কাছ থেকে নিজের নাকটা সন্তর্পণে কিঞ্চিৎ সরানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না। হঠাৎ মেয়েটা সোজা

হয়ে বসে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। চমকে উঠলেন। পাগল নাকি! সব গুণই আছে! বেশ যোগাড় করেছে চন্দনলাল। মেয়েটা টেনে টেনে হাসতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলেন, হাসছ কেন? মেয়েটা বললে, আপনি ভয় পেয়েছেন, না? খুব ভয় পেয়েছেন? ব'লে আবার খিল খিল ক'রে হাসি। তিনি বললেন, ভয়? তা একটু পেয়েছি বইকি! অন্যায় হয়েছে কি? মেয়েটি বললে, অন্যায় নয়। তবে সব মিথ্যে কথা। আপনাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছিলুম। কিছু হয় নি আমার। পাশে সুইচ টিপতেই গাড়ির ছাদে আলো জ্ব'লে উঠল। রুমালটা দেখিয়ে বললে, দেখুন রক্ত-টক্ত কিছুই নেই।

বিদ্যুতালোকে মেয়েটির চোখ-মুখ হাসিতে ঝিকমিক করতে লাগল। মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। সম্পর্কের ছেদ হয় নি ওর সঙ্গে। তার পরেও তাঁর বাড়ি এসেছিল কয়েকবার। ওকে পুরনো চাকরি ছাড়িয়ে নিজের আপিসে চাকরি দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের টাইপিস্ট। মাসে দু শো টাকা ক'রে মাইনে দিতেন। ওতে ওদের সংসার বেশ চ'লে যেত। তাঁর আপিসেও বেশি পরিশ্রম করতে হ'ত না। মাস কয়েকের মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'ল ওর। একবার তাঁর সঙ্গে কলিয়ারি এসেছিল। একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন একদিন

মোটরে ক'রে—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে। রাস্তার ধারে একটা গাছের নীচে ওর ছবি তুলেছিলেন।

হৈম-মন্দিরের কাজ অমিতাভের পরিচালনায় খুব সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল। দিন দিন প্রসার লাভ করছিল। অনেক নূতন শিল্পী যোগ দিল। মেয়ে পুরুষ দুই। এত বেড়ে উঠল যে, একসঙ্গে মেয়ে-পুরুষদের কাজ করা অসুবিধা হচ্ছিল। অমিতাভর পরামর্শে স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য দুটি পৃথক বিভাগ খোলা স্থির হ'ল। আরও জায়গা কেনা হ'ল। নূতন ক'রে বাড়ি তৈরী হ'ল। স্ত্রী-বিভাগ নূতন বাড়িতে উঠে গেল। শেফালিকাকে নারী-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত ক'রে দিলেন।

একসঙ্গে কাজ করতে করতে অমিতাভ ও শেফালিকার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ক্রমে প্রেম জন্মাল। ওদের বিয়ে দিলেন। যৌতুক দিলেন দশ হাজার টাকা। হৈমর বাড়িতে তারা বাস করতে লাগল।

ওদের বিয়ের ছবিটির দিকে জগদীশপ্রসাদ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। শেফালীর মুখে তৃপ্তির হাসি। জীবনে অনেক পথে-বিপথে ঘুরে শেফালিকা শেষে চিরদিনের আশ্রয় পেয়েছে। অমিতাভের প্রেমধারায় স্নান ক'রে ও সর্ব ক্লেদ, সর্ব গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছে, পবিত্র হয়েছে।

আর একটি ছবি। একটা চেয়ারে তিনি ব'সে। পায়ের

কাছে ব'সে আছে শেফালিকা ও অমিতাভ। তার কোলে একটি নধরকান্তি শিশু। অমিতাভ ও শেফালিকার ছেলে। অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেদিন ছবি তোলা হ'ল।

আরও কয়েকটি ছবির পরে একটি ছবিতে দৃষ্টি পড়ল। তাঁর আপিসের কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ছবি। নববর্ষে সরকার তাঁর পরম রাজভক্তির জন্য 'নাইটহুড' উপাধি দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। তাঁর আনন্দের চেয়ে তাঁর কর্মচারীদের আনন্দই বেশি হ'ল। তাঁকে সংবর্ধনা জানাল তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে।

আর এক পৃষ্ঠা ওল্টালেন জগদীশপ্রসাদ। প্রথম ছবি, এলসি ও তিনি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে এলসি। ওকে নিয়ে সিমলে গিয়েছিলেন। সেখানে ছবি তুলিয়েছিলেন। এলসিকে পেতে বিশেষ সাধনা করতে হয় নি। আপনি জুটেছে—জুড়ে বসেছে। সাহেবপাড়ায় ঘর নিয়ে থাকে। ওর একমাত্র ছেলে বিলেতে থেকে পড়ে। সব খরচ বহন করেন তিনি। এলসি অবশ্য তাঁর আপিসে চাকরি করে। টাইপিস্ট, গৌরবে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। মাইনে পায় ভাল। ওর সঙ্গে তাঁর আসল সম্পর্ক আপিসের সকলেই জানে। এলসির দিক থেকে জানাবার ত্রুটী নেই।

তাঁর একটা কলিয়ারির ম্যানেজার ছিল ডেভিড রস্। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। এলসির স্বামী। তুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল খুবই। রসের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছিল। এলসির বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি ছিল না। আকৃতিতেও তফাত ছিল। রস্ বেজায় মোটা। এলসি তন্বঙ্গী। প্রকৃতিতেও তফাত ছিল। রস্ ছিল অত্যন্ত নীরস, কাট-খোট্টা। বুলডগের মত মুখটা ভেংচে থাকত সব সময়েই। এলসি ছিল মধুর, স্নিগ্ধ, সদাই হাস্যমুখী। রস্ অত্যন্ত মাতাল ছিল। সারা দিন-রাত মদে চুর হয়ে থাকত। যা রোজগার করত মদেই উড়িয়ে দিত। দিন চলা দায় হয়ে উঠত মাঝে মাঝে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করত রাতদিন। তিনি ওখানে থাকলে ওদের সাহায্য করতেন। এলসি রূপসী ছিল। বিয়ের বয়স পার হয়ে যায় নি—অন্তত ওদের সমাজে। ইচ্ছা করলে রস্‌কে ছেড়ে গিয়ে ভাল লোককে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু একমাত্র ছেলে রবার্টসের জন্য পারে নি। রবার্টস্ ওর বাবাকে বড় ভালবাসত। আর ছেলেটি ছিল এলসির নয়নের মণি। ছেলের জন্যেই রসের সব অত্যাচার সহ্য ক'রেও তার স্ত্রীত্বের বোঝা বহন করছিল। তিনি কলিয়ারিতে গেলে এলসি প্রায় তাঁর কাছে আসত। গল্পগুজব করত। স্বামীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করত। স্বামীর মাইনেটা তার হাতে সরাসরি দেবার জন্যে অনুরোধ করত। তিনি ইচ্ছে

সত্ত্বেও পারতেন না। রস্ রুক্ষমেজাজের লোক। চাকরি ছেড়ে দেবে ভয় করতেন। রস্ খুব কর্মদক্ষ ম্যানেজার ছিল। ও গেলে কলিয়ারির ক্ষতি হ'ত। তবে তিনি প্রায় এলসিকে সাহায্য করতেন। যখন ওখানে থাকতেন তখন শুধু নয়। কলকাতা থেকেও। তাঁর কলকাতা আপিসের একজন কর্মচারী প্রত্যেক মাসে কলিয়ারি যেত। তার হাতে গোপনে টাকা পাঠিয়ে দিতেন। তিনি কলিয়ারিতে গেলে এলসি নানা খাবার তৈরী ক'রে পাঠাত। তাঁর সাথীহীন জীবনের জন্য সহানুভূতি জানাত। পারস্পরিক সহানুভূতির ভিত্তিতে ধীরে ধীরে একটি প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠল দুজনের মধ্যে। হঠাৎ রস্ মারা গেল। হাই ব্লাডপ্রেসার ছিল। খুব মদ খেয়েছিল একদিন। সকালে দেখা গেল, ম'রে প'ড়ে আছে। মৃত্যুর খবর পেয়েই তিনি গিয়েছিলেন। কলিয়ারির ব্যবস্থা করবার জন্যে। এলসির সঙ্গে দেখা করলেন। একটু কাঁদল চোখে রুমাল দিয়ে। রবার্টস্ মায়ের কোলে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ওকে আদর ক'রে ভোলাবার চেষ্টা করলেন। এলসিকে ভোলাতে হ'ল না। অবলীলাক্রমে রোদন সংবরণ ক'রে মাননীয় অতিথির সৎকারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিছুদিন পরেই এলসিকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। চাকরির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ওর ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেন।

আরও কয়েকটি ছবি এলসির সঙ্গে। ধীরে ধীরে এলসি ও তাঁর মধ্যে একটি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠল। শিউলি চ'লে যাবার পর থেকে পুরোপুরি নারী-বর্জিত জীবন যাপন করবেন ব'লেই সঙ্কল্প করেছিলেন। এমন কি একটা ভাল গুরু খুঁজে তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন ব'লে স্থির করেছিলেন। ভোগ ও আসক্তিময় জীবন বর্জন ক'রে ত্যাগ ও বৈরাগ্যময় জীবন যাপন করবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করছিলেন। এলসি সব মাটি ক'রে দিল। তাঁর কাছে প্রচুর উপকার পেয়ে ও কৃতজ্ঞতায় এমনই কোমল ও সরস হয়ে উঠতে লাগল যে, একদিন অবলীলাক্রমে নিজেকে স'ঁপে দিল তাঁর নিবস্ত লোভানলে। তাঁর লোভ আবার ব'লে উঠল—শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, এলসি তাঁকে ভালবাসে। প্রেমিকার মত না হতে পারে, বন্ধুর মত নিশ্চয়ই। যৌবনের চাপল্য ওর শেষ হয়ে গেছে। ক্ষীরের মত জ'মে উঠেছে ওর মন। ওকে নেহাত ছেঁটে না ফেললে তাঁর জীবনে ও অচঞ্চল হয়ে বিরাজ করবে—এ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস।

আর একটা ছবিতে দৃষ্টি আটকে গেল তাঁর। মহাত্মার ছবি। কলকাতায় মহাহত্যার পর মহাত্মা কলকাতা এলেন। অনেক চেষ্টায় তাঁকে হৈম-মন্দিরে এনেছিলেন। সেই সময়ের ছবি।' মহাত্মা একজন দুর্গত মেয়ে-শিল্পীর সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আর এক পাশে

শেফালিকা এই উপলক্ষ্যে মহাত্মার পায়ের নীচে কস্তুরীবাঈ ফণ্ডের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকার একটি চেক প্রণামী দিয়েছিলেন।

আরও কয়েকটি ছবির পরেই স্বাধীনতা-দিবসের কয়েকটি ছবি। হৈম-মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসবের ব্যবস্থা হ'ল। পুরোহিত কলকাতার জনৈক নামজাদা কংগ্রেসী নেতা। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরেছিলেন তিনি সেদিন। নেতা-মশায় পতাকা তুললেন। মন্দিরের কর্মীবৃন্দ বার বার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করতে লাগল। ছবি তোলা হয়েছিল প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের। একটিতে নেতা-মশায় ঘাড় বাঁকিয়ে পতাকা তুলছেন। আর একটিতে তিনি, নেতা-মশায়, চন্দনলাল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আর একটিতে নেতা-মশায়, তিনি, শেফালী ও অমিতাভ।

সেই দিন বিকালে চন্দনলালের স্টীমলঞ্চে চ'ড়ে তিনি, এলসি, চন্দনলাল ও মণিমালা গঙ্গাবক্ষে অনেক দূর বেড়াতে গিয়েছিলেন। মণিমালা তাঁকে ছেড়ে যাবার পর বহুদিন তাঁর সামনে বেরুত না। তাঁর চিত্তাকাশ থেকে খ'সে পড়বার পরও আরও অনেকের আবির্ভাব হতে দেখে ক্রমে ওর সঙ্কোচ কাটল। এলসি আসবার পর ওর ব্যবহার খুব সহজ হয়ে উঠল।

লঞ্চের উপর কয়েকটি ছবি তুলেছিলেন তিনি। এলসির একা একটি ছবি। সেটি নিজের কাছে রেখেছিলেন। সেটি

চোখে পড়ল। লঞ্চের রেলিং ধ'রে এলসি দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে ওর ছোট কোঁকড়া চুলগুলি উড়ছে।

আর একটা ছবি। নীচে লেখা—১৯৪৮। চন্দনলাল মোটর তৈরির ফ্যাক্টরি খুলল। নাম—নেতাজী মোটর ওয়ার্কস্। হীরালাল চন্দনলাল অ্যাণ্ড কোং, ম্যানেজিং এজেণ্টস জে. পি. চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং। উদ্দেশ্য সত্যিকার মোটর গাড়ি তৈরি করা নয়, বিলেত থেকে মোটরের বিভিন্ন অংশ আনিয়ে এখানে জুড়ে চালু করা। কলকাতা থেকে মাইল কয়েক দূরে দু শো বিঘে জমি কিনে ফ্যাক্টরি বসানো হ'ল। প্রতিষ্ঠা-দিবসে পৌরোহিত্য করলেন—বাংলার দেশী লাটসাহেব। কলকাতা থেকে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেই দিন অনুষ্ঠানের পর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ফ্যাক্টরির এক পাশে চাঁদোয়া টাঙিয়ে বসবার ব্যবস্থা হ'ল। এক-একটি টেবিল, তার পাশে চারখানি চেয়ার। লাট-সাহেব খেলেন না। ঘুরে ঘুরে অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। কয়েকটি বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে গল্প করার সময়ে ছবি তোলা হয়েছিল। সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছেন লাটসাহেব। তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছেন—তিনি ও চন্দনলাল।

চন্দনলাল মহাত্মার স্মৃতিরক্ষা-তহবিলে দু লক্ষ টাকা চাঁদা দেবে জানাল। সঙ্গে সঙ্গে লাউড্স্পীকারে লাটসাহেব

অতিথিদের এই সংবাদ জানিয়ে দিলেন। প্রশংসাসূচক ধ্বনি করলেন অতিথিরা। লাটসাহেব গাড়িতে ওঠবার সময়ে তাঁর হাতে দু লক্ষ টাকার চেক দিল চন্দনলাল।

এর আগে চন্দনলাল ও তিনি কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছিলেন। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস সভার মাতব্বরদের নানাভাবে মনস্তুষ্টির ব্যবস্থা ক'রে তাঁদের অনুগ্রহ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা ক্রমেই প্রসন্ন হয়ে উঠছিলেন তাঁদের ওপরে। এই টাকাটা দিয়ে চন্দনলাল শুধু বাংলা কংগ্রেসের রথীদের নয়, ভারতীয় কংগ্রেসের মহারথীদের চক্ষেও কংগ্রেসের একজন চিহ্নিত সেবক ব'লে গণ্য হ'ল।

আর এক পৃষ্ঠা ওল্টালেন জগদীশপ্রসাদ। প্রথম ছবিটিতে চোখ পড়ল। বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের ছবি। দুর্ভাগিনী অন্নপূর্ণাকে তিনি ভোলেন নি। জীবনের খেলা ওর জমতে না জমতে শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল না, নিজে শেষ ক'রে দিতে হ'ল তাকে। ভাগ্যের বিড়ম্বনা। অথচ কত আশা ছিল, কত সাধ ছিল! একদিন বলেছিল, বিয়ে কর না আমাকে। আজকাল তো বিধবাদের বিয়ে হয়। একটু ম্লান হেসে বলেছিল, বিয়ে তো আমাকেই করতে, তোমার রাণী বাধা না দিলে! বলত, দেখ, এ ভাল লাগছে না আমার। একেবারে নিজের ক'রে নাও, আমিও তোমাকে নিজের ক'রে

নিই। না হ'লে মনে হচ্ছে যেন পরের জিনিস চুরি ক'রে ভোগ করছি। মণিমালা, শিউলি—কেউ এ ধরণের কথা বলে নি কোনদিন। আসলে এরা তাঁকে প্রাণমন দিয়ে চায় নি। এদের সম্পর্ক ছিল স্থূল, দেহাত্মক, নিছক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। হৈমবতীর মতই তাঁকে প্রাণমন দিয়ে একান্তভাবে অন্নপূর্ণা চেয়েছিল। তা ছাড়া তার মা হবার সাধ ছিল খুবই। বিয়ের পর স্বামীসঙ্গ সে বেশিদিন পায়নি। স্বামীর তখন ছাত্রাবস্থা। কলকাতায় এম. এ. পড়ত। ছুটিছাটাতে বাড়ি আসত। তা ছাড়া ধর্ম-বাতিক ছিল। বিয়ে করবার ইচ্ছা ছিল না। বাপ-মা জোর ক'রে বিয়ে দিয়েছিল। কাজেই স্বামীর সন্তান গর্ভে ধারণ করবার সৌভাগ্য হয় নি অন্নপূর্ণার। তাঁকে পাবার পর, ওর যে-সাধ স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ম'রে গিয়েছিল, সেই সাধ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। ঠারে-ঠোরে বলেছিল কতদিন,' তোমার বাড়ি, বাড়ি ব'লে মনে হয় না। মনে হয় যেন দোকান। কেমন সাজানো-গোছানো—ঝকঝকে তকতকে।

প্রশ্ন করেছিলেন, কেন? বলেছিল, একটা ছেলে থাকলে এমন থাকতে পারত নাকি? এটা ভাঙত, ওটা ছিঁড়ত, এটা টেনে ফেলে দিত; ওখানটা কালির দাগ লাগিয়ে দিত। ছেলে না হ'লে বাড়ি! একদিন বললে, তোমার বাড়িতে কাজ-কর্ম কিছু নেই, সারাদিন যেন কাটতে চায় না। একটা যদি ছেলে

থাকত, তাকে দেখতে-শুনতে, নাওয়াতে-খাওয়াতে, সামাল-সামাল করতে দিন কোন্ দিক দিয়ে কেটে যেত বুঝতে পারতাম না। একদিন বললে, তোমার এত ধন-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য কি হবে? কে ভোগ করবে? একদিন হেসে তিনি বলেছিলেন, একটা ছেলে কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার? মুখ টিপে হেসে বলেছিল, বলতে পারি। কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, আমার কাছে। হতভাগিনীর কোন সাধ মিটল না। নিষ্ফলা চ'লে গেল। কোন চিহ্ন রেখে গেল না পৃথিবীতে, যাকে আশ্রয় ক'রে ও বেঁচে থাকতে পারত। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ও নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। না, ফুরিয়ে যায় নি। ফুরোতে দেন নি তিনি। ওকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন।

জমিদারবাবুর বাড়িটাতেই প্রথমে গ্রামের স্কুল বসেছিল। কৃষ্ণভাবিনী-বিদ্যা-মন্দির। তাঁর মায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য স্থাপন করেছিলেন তিনি। স্কুলের নূতন বাড়ি তৈরি হ'ল বৎসর খানেক পরে। স্কুল সেখানে উঠে গেল। বাড়িটাতে স্কুলের শিক্ষকদের ও ছাত্রদের থাকবার জন্য দেওয়া হ'ল। বৎসর খানেকের মধ্যে ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। বাড়িটা খালি হ'ল। এখানে গ্রামের মেয়েদের জন্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। অন্নপূর্ণার নামে নামকরণ হ'ল—অন্নপূর্ণা-বালিকা-বিদ্যালয়। স্কুল-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান হ'ল। কলকাতা

থেকে অনেক কংগ্রেসী মাতব্বরদের নিমন্ত্রণ করা হ'ল। জেলা-কংগ্রেসের মাতব্বররাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পৌরোহিত্য করেছিলেন—প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। অতিথিবর্গের যথোচিত সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল।

পাশাপাশি কয়েকটি ছবি। একটা ছবিতে তাঁর আপিসের কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি ব'সে আছেন। তাঁর পাশেই চন্দনলাল। তাঁর গলায় মালা। আপিসের কর্মচারীরা তাঁর জন্মদিন-উৎসব করেছিল। তাঁর আরও শ্রীবৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল। পরিবর্তে তিনি তাদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কয়েকটা ছবির পরে আর একটা ছবিতে দৃষ্টি আটকাল। করপোরেশনে কাউন্সিলার নির্বাচিত হলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তিন-পুরুষী কাউন্সিলার নগেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে। দাঁড়াতে পারল না তাঁর কাছে। নগেন কাজের লোক। করদাতাদের অনেক উপকার করে। কিন্তু সার্বজনীন দুর্গোৎসবে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দেবার ক্ষমতা তার নেই। তা ছাড়া পাড়ায় ব্যায়াম-সমিতি সৎকার-সমিতি তাঁরই টাকাতে চলছে এখন। লাইব্রেরির জন্য বৎসরে মোটা টাকা চাঁদা দেন। সম্প্রতি সঙ্গীত-বিদ্যালয় খুলে দিয়েছেন ছেলে-মেয়েদের জন্য। ভোট গণনার ফল বার হবামাত্র তাঁর সমর্থক ও সাহায্যকারীর দল হৈ-হৈ ক'রে ছুটে

এল। তাঁকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে গলায় মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানাল। তিনি সবিনয়ে যুক্তহস্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। সেই অবস্থার ছবি তোলা হয়েছিল। তাঁকেও দিয়ে গিয়েছিল একটা ছবি। তিনি যথাস্থানে এঁটে রেখেছিলেন।

আর একটা ছবি। তাঁর বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রামে একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন। নামকরণ হ'ল—কালীপ্রসাদ-দাতব্য-চিকিৎসালয়। প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন—জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি। ছবি তোলা হ'ল।

এক পাশে ছুটো ছবিতে চোখ পড়ল। চন্দনলাল দিল্লীতে কেন্দ্রীয় গণ-পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হ'ল। একটা বিরাট পার্টি দিয়েছিল তার ক্রীক রোয়ের বাড়িতে। তার ছবি। চন্দনলাল কোন একজন কংগ্রেসী মাতব্বরের সঙ্গে হাস্যবদনে আলাপ করছে—এ অবস্থায় ছবি তোলা হয়েছে।

মণি-চন্দন লজে পার্টি দিল মণিমালা। তিনি ও এলসি এই ছুজন মাত্র নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বাগানে চড়ি-ভাতি হ'ল। রান্না করল মণিমালা। এলসি সাহায্য করেছিল। মণিমালা খদ্দরের শাড়ি প'রে ছিল। আঁচলটা কোমরে জড়িয়েছিল। এলসিও শাড়ি প'রে ছিল সেদিন। মণিমালা পরিয়ে দিয়েছিল। একটা বেল্ট দিয়ে কোমরটা বেশ ক'রে বেঁধে দিয়েছিল। মন্দ

দেখাচ্ছিল না ওকে। ছবি তোলা হ'ল খাওয়ার পরে। তুলল চন্দনলালের কর্মচারী, যে ওখানকার সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছে। বাগানের এক পাশে একটা বকুলগাছের নীচটা ইঁট ও সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়েছিল মণিমালা। সেইখানে বসলেন সবাই। চন্দনলালের পাশে মণিমালা, তাঁর পাশে এলসি।

আর একটা ছবি। বাংলার লাটসাহেব হৈমবতী-সেবা-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করছেন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পরিধানে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি ও চাদর। কাছাকাছি রয়েছেন কয়েকজন মন্ত্রী, কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি-মেয়র ও কয়েকজন মাতব্বর কাউন্সিলার। হৈমবতীর সে অনুরোধ তিনি ভোলেন নি। 'আমার স্মৃতিকে অমর অক্ষয় ক'রে রাখতে পারবে না ?' পৃথিবীতে কিছুই অমর নয়, অক্ষয় নয়। কালের করাল লেহনে সবই ক্ষয় হয়ে যাবে, লয় হয়ে যাবে একদিন। দৃঢ়তম স্মৃতিসৌধও চিরন্তন হয়ে থাকবে না। তবু মানুষ নিজের ও প্রিয়জনের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। হৈমবতীর স্মৃতিকেও তিনি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন। যত দীর্ঘকাল সম্ভব। হৈম-মন্দির স্থাপন করেছেন। এর আর্থিক ভিত্তি যতদূর সম্ভব দৃঢ় ক'রে দিয়েছেন। শেফালী ও অমিতাভের হাতে যতদিন পরিচালনার ভার থাকবে ততদিন এর স্থায়িত্ব

সম্বন্ধে কোন চিন্তা নেই। ওদের অবর্তমানে কি হবে বলা যায় না। হৈমবতীর স্মৃতিকে আরও পাকা-পোক্ত ক'রে রেখে যেতে চান। সেই অভিপ্রায়ে হৈমবতীর নামে হাসপাতাল স্থাপন করবার সংকল্প করলেন। মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের মেয়েদের বিনা-খরচে অথবা অল্প-খরচে সেবা-চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকবে সেখানে। লেকের কাছাকাছি অনেকখানি জায়গা কেনা হ'ল। সুবিজ্ঞ এঞ্জিনীয়ার ও ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পরিকল্পনা তৈরি হ'ল। খ্যাতনামা কণ্ট্রাক্টারের হাতে নির্মাণের ও সজ্জা-করণের ভার দেওয়া হ'ল। শুভদিনে শুভক্ষণে শহরের গণ্যমান্য শহরবাসীদের সমক্ষে ভিত্তি স্থাপন করলেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—প্রদেশপাল।

হাসপাতালের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিদেশে সুশিক্ষিত, সুবিজ্ঞ কয়েকজন চিকিৎসক যোগ্য দক্ষিণায় চিকিৎসার ভার নিতে রাজী হয়েছেন। আগামী বৎসরের প্রারম্ভ থেকে কাজ সুরু হবে। এর সমস্ত খরচ তিনি হৈমবতীর সঞ্চিত টাকা থেকে দিয়েছেন। তাঁর জীবিতকালে হৈমবতীর সম্পত্তির আয় থেকে তিনি এর পরিচালনা করবেন। তাঁর অবর্তমানে পরিচালনার জন্য তিনি শহরের গণ্যমান্য বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে আইনসঙ্গতভাবে একটি সমিতি গঠন করেছেন। হৈমবতীর সমস্ত সম্পত্তি ও হাসপাতালের ভার তাঁদের হাতেই

থাকবে। সমিতির সভাপতি হবেন হৈমবতীর পুত্র। তার মত জানবার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। সে সানন্দে সম্মতি দিয়েছে। কার্যারম্ভ-দিবসে যোগদান করবার সাগ্রহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

বোতলে যতটুকু পানীয় বাকি ছিল গ্লাসে ঢেলে পান করলেন জগদীশপ্রসাদ। নূতন একটি সিগার ধরালেন। হেলান দিয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজলেন। হৈমবতীর জীবিতকালে পুত্রের সঙ্গে ওর মিলন ঘটিয়ে দিতে পারেন নি। শেষযাত্রার দিনেও হৈম চোখের জল ফেলে গিয়েছিল। ক্ষীণ করুণকণ্ঠে বলেছিল, একবার তার মুখটি দেখে যেতে পেলাম না! একবার দেখাতে পারলে না? বললে, আগে চোখ বুজলেই ওর মুখ দেখতে পেতাম। আজকাল অনেক চেষ্টা করি, দেখতে পাই না। এমন হতভাগী মা আমি। হৈমবতীর স্মৃতি-চিহ্নের সঙ্গে ওর ছেলেকে যুক্ত ক'রে দিতে পেরেছেন। হৈমবতী সুখী হবে? তৃপ্ত হবে?

আগামী একশো বৎসরের মধ্যে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের চেহারা কি হবে, যারা কাস্তে-হাতুড়ি উঁচিয়ে সব ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড ক'রে দেবার আস্ফালন করছে, তারা সফলমনোরথ হবে, না, কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে—কেউ বলতে পারে না। তবু আশা করা যায়, আগামী একশো বৎসর অন্তত হৈমবতীর স্মৃতি এই প্রতিষ্ঠানটিকে আশ্রয় ক'রে

বেঁচে থাকবে। তাঁর মা, বাবা, এমন কি অন্নপূর্ণার স্মৃতিও বেঁচে থাকবে বহুদিন। কিন্তু তাঁর? যে বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটি তিনি গ'ড়ে তুলেছেন, তার মধ্যে তাঁর স্মৃতি বেঁচে থাকবে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা এর মালিক হবে। তারা কি তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে? মনে হয় না। অত্যন্ত স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচিত্ত ওরা। ওদের জন্য অনেক করেছেন। দেশের মাটির চালাঘর ভেঙে দোতলা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন, জমিদারি কিনে দিয়েছেন, ওদের শিক্ষিত ক'রে তুলে উচ্চপদে বসিয়ে দিয়েছেন—তবু ওদের সন্তোষ নেই। কৃতজ্ঞতা নেই। অন্নপূর্ণা ঠিক বলেছিল—ছেলে না হ'লে চলে? কে ভোগ করবে এত সম্পত্তি? কে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে চিরকালের জন্য? কে মৃত্যুর পর মুখাগ্নি করবে? তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রীত্যর্থে তর্পণ করবে, শ্রাদ্ধ করবে? একমাত্র নিজের পুত্র ছাড়া কেউ করবে না—কেউ করবে না, কারও অধিকার নেই করবার? কে দেবে পুত্র? অন্নপূর্ণা সানন্দে সাগ্রহে দিতে চেয়েছিল। এলসি দেবে কি? হয়তো দেবে। হয়তো, কেন—নিশ্চয় দেবে। সম্পত্তির লোভে নয়। সে ভালবাসে তাঁকে। তার ছেলেকে তিনি বিলেতে রাজার ছেলের মত রেখে হ্যারোতে পড়াচ্ছেন, তাকে সুশিক্ষিত ও সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তার

জন্য কৃতজ্ঞতায় নয়। তাঁকে ভালবাসে সে। এই ক' বছর ধ'রে সে তাঁকে ভালবাসবার সাধনা করেছে। আগে হৈমর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রায় জিজ্ঞাসা করত। বলত, তিনি কি কি করতেন সব আমাকে বল। তিনি যা যা করতেন আমিও তাই করব। তার সাজ-সজ্জার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রায়ই শাড়ি প'রে থাকে আজকাল। মাথার চুল ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠে পড়েছে। বলেছিল একদিন—তোমাদের মেয়েদের মত সিঁথিতে সিঁদুর পরতে ইচ্ছা করে, পায়ে আলতা। তিনি বলেছিলেন, বিধবাদের তো ওসব চলে না। অপরূপ মুখ চোখ ও ভ্রূর ভঙ্গী ক'রে সন্তর্পণে বললে—আমি বিধবা? তবে—। হঠাৎ তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, তুমি কে? সেই দিনই কথা হয়েছিল। ও বিয়ে করতে রাজী। বললে, আগে হিন্দু ক'রে নাও। তারপর হিন্দুমতে বিয়ে হবে। মাথা নেড়ে বললে, কি নাম হবে জান? বল দেখি? বললেন, ইলা দেবী। বললে, ঠিক বলেছ। এলসি—ইলা। খবরের কাগজে ছবি বেরোবে—তোমার পাশে কনে সেজে দাঁড়িয়ে আছি। এলসিকে বিয়ে করবেন। ওর ছেলেকে ও দেখে নি অনেক দিন। বিয়ের পরে ওকে নিয়ে বিলেত যাবেন। ওরই সাহায্যে একটি বংশধারার প্রবর্তন করবেন। যা কালের তৃষিত বালুবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে অব্যাহত গতিতে

প্রবাহিত হবে। তারই তরঙ্গের কলধ্বনিতে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

সোজা হয়ে ব'সে আর একটি ছবির উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। এলসি, তিনি, চন্দনলাল ও মণিমালা। চন্দনলাল ও মণিমালা দিল্লী গেল। তিনি ও এলসি ওদের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলেন। চন্দনলালের অনেক কর্মচারীও গিয়েছিল। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর ওদের রিজার্ভড্ কামরার সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। তখন ছবি তুলেছিল চন্দনলালের একজন কর্মচারী। তাঁকে একখানা ছবি উপহার দিয়েছিল।

আরও কয়েকটি ছবির পরে শেষ ছবির উপরে দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল। হঠাৎ মনে হ'ল, জীবনে সাফল্যগিরি-আরোহণে অনেক দূর উঠে এসেছেন। গোপালগঞ্জ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক থেকে কলকাতা শ্রেষ্ঠী-সঙ্ঘের সভাপতি। আরও উঠতে হবে। কয়েকটি শৃঙ্গ মাত্র অতিক্রম করেছেন। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। পিছনে সুদীর্ঘ বন্ধুর বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম ক'রে এসেছেন। সামনে আরও পথ বাকি। দীর্ঘ নয়, দুর্গম। গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন কি? যৌবনে যে কঠিন মন, অবিচলিত সঙ্কল্প নিয়ে দ্বিধাশূন্য দৃঢ়পদে পথের যত কাঁটা মাড়িয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন—এখন সে যৌবন নেই,

দেহের ও মনের সে দৃঢ়তা নেই। জীবন মধ্যগগন অতিক্রম ক'রে অস্তাচলাভিমুখী হয়েছে। তাঁর দেহ অবশ্য যথাসম্ভব সুস্থ ও সবল আছে। শহরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার সপ্তাহে দুবার দেখে যাচ্ছেন। আশ্বাস দিচ্ছেন—খুব চমৎকার স্বাস্থ্য আছে আপনার। অনেকদিন বাঁচবেন এখনও। অনেক কাজ ক'রে যেতে পারবেন। অবশ্য রক্তের একটু চাপ বেড়েছে। বুকের বাঁ পাশটায় একটু বেদনা বোধ হয় মাঝে মাঝে। ডাক্তার বলেছেন—ফল্‌স্ এ্যাঞ্জাইনা। ও কিছু নয়। বয়সের তুলনায় রক্তের ওটুকু চাপ-বৃদ্ধি স্বাভাবিক। নির্ভয়ে থাকুন। নির্ভয়ে এগিয়ে চলুন। তবু বার্ধক্য, জরা ও মৃত্যুকে কে রোধ করতে পারে? এমন কোন চিকিৎসক আছে কি? এমন কোন ঔষধের আবিষ্কার হয়েছে কি? তা হ'লে পৃথিবীর বড় বড় লোকরা কেউ মরত না। স্টালিনকে মরতে দিত না রাশিয়ার ডাক্তাররা, বৈজ্ঞানিকরা। রসের পসরা খালি হতে না হতে বার্নার্ড শ'কে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে চ'লে যেতে দিত না ইংলণ্ডের ডাক্তাররা। নিয়তির বিধান দুর্বার। যেতে হবেই। দেহ দিন দিন জীর্ণ ও শিথিল হবেই। ক্ষুধা থাকবে, খাবার শক্তি থাকবে না। পিপাসা থাকবে, পান করবার শক্তি থাকবে না। হঠাৎ মনে পড়ল একটা ভিখারীর কথা। আপিস যাচ্ছিলেন, হঠাৎ গাড়িটাকে দাঁড়াতে হ'ল। গাড়ির পাশে

পশুর মত অবোধ্য আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন— একটি ভিখারী দাঁড়িয়ে আছে। শিউরে উঠলেন ওর বীভৎস চেহারা দেখে। সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ রোগের আক্রমণ-চিহ্ন। দেহ জীর্ণ-শীর্ণ ও মলিন। হাত-পায়ের আঙুল সব খ'সে গেছে। সর্বাঙ্গে ঘা। মুখটা ফুলে গেছে। ঠোঁটে ঘা। নাক ব'সে গেছে, জিবটা অসাড় হয়ে গেছে। চোখ দুটো লাল। কথা বলতে পারে না। নাকী স্বুরে একটা অবোধ্য ধ্বনি করে। খেতেও কষ্ট হয় সম্ভবত। তাকাতেও কষ্ট হচ্ছিল তার দিকে। মানুষের ভয়াবহ পরিণাম দেখে বুকের ভিতরটা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাঁর পকেটে যত খুচরো টাকা-পয়সা ছিল সব মুঠো ভর্তি ক'রে ওর প্রসারিত অঙ্গুলিহীন অঞ্জলিতে ঢেলে দিয়েছিলেন। সব ধরে নি অঞ্জলির মধ্যে। প'ড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। লোভে ক্ষোভে আর্তনাদ ক'রে উঠল। তারপর কি হ'ল দেখেন নি। গাড়ি চলতে শুরু করল। মনে হ'ল— তাঁর জীবনও অমনি হয়ে আসবে একদিন। তীব্র কামনায় দুই অক্ষম অঞ্জলি প্রসারিত ক'রে চাইবেন, কিন্তু ধ'রে রাখতে পারবেন না। খ'সে পড়বে অঞ্জলি থেকে। লোভে ক্ষোভে নিষ্ফল আর্তনাদ করবেন ওই ভিখারীটার মত।

সভয়ে চিন্তার সূত্রটাকে ছিঁড়ে ফেললেন। ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন। দুই করতল প্রসারিত ক'রে চক্ষের সামনে ধরলেন।

উল্টেপাল্টে দেখলেন। সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত গাত্রচর্ম। ছাই-দানির উপর থেকে অর্ধদগ্ধ সিগারটা নিয়ে আবার ধরিয়ে নিলেন।

দেহ দুর্বল হোক, জরাগ্রস্ত হোক, যতদিন বেঁচে থাকবেন, আগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবেই। যত দিন প্রাণ থাকবে, প্রাণশক্তির অবমাননা করবেন না। পৃথিবীতে কোন প্রাণীই করে না। শামুকও সাধ্যমত আগিয়ে চলে। জড়ের মত বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ভাল। হ্যাঁ, চেষ্টা করবেন। তরী জীর্ণ হোক, নদী তরঙ্গ-সঙ্কুল হোক, যথাশক্তি শক্ত ক'রে হাল ধ'রে পাড়ি জমাতেই হবে। যথারীতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়ে পূজার্চনা ক'রে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতাদের আশীর্বাদ লাভ তো করেছেন। আশা তো দিয়েছেন তাঁরা সুবিধেমত একটা বাই-ইলেকশান হ'লেই তাঁকে অ্যাসেম্ব্লিতে ঢুকিয়ে দেবেনই। একবার ঢুকে পড়তে পারলে নিজের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জন করতে পারবেন —এ বিশ্বাস নিজের উপর তাঁর এখনও আছে। অদূর-ভবিষ্যতে হয়তো মন্ত্রীও হয়ে যেতে পারেন। তারপর আগামী ইলেকশনে, কংগ্রেসের প্রতিপত্তি যদি ততদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হবেন নিশ্চয়ই। হয়তো একদিন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীও হয়ে যেতে পারেন।

ঢং ঢং ক'রে দুটো বেজে গেল। উঠে দাঁড়ালেন। জানলার

কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারা-ভরা এক খণ্ড আকাশ স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ জানাল তাঁর দৃষ্টিকে। তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। পৃথিবীর বিরাট রঙ্গমঞ্চে নিত্য নূতন মানব-দল অভিনয় ক'রে চলেছে। এরাই তাঁর নীরব নির্বিকার দর্শক। এদের চোখের সামনেই একদিন সূর্য নিবে যাবে, পৃথিবীর বুক হিমশীতল হয়ে উঠবে। পৃথিবীর বুক থেকে শেষ প্রাণকণাটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে একদিন। এদের লক্ষ লক্ষ নয়নে একবারও নিমেষ-পাত হবে না।

জানলার কাছ থেকে চ'লে এসে বাথরুমে ঢুকলেন। মুখে চোখে মাথায় জল দিলেন। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে দীর্ঘ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে লাগলেন। মুখটিকে আয়নার কাছে নিয়ে এসে ভাল ক'রে দেখলেন। মুখের গঠন-সৌষ্ঠব, লাবণ্য নষ্ট হয় নি এখনও। চিবুকে, গালে, গলায় কিঞ্চিৎ শিথিলতা এসেছে মাত্র। নাকের দু পাশে খাঁজের আভাস জাগতে শুরু করেছে। বয়সের তুলনায় ও কিছু নয়। তাঁর অনেক বন্ধু এই বয়সেই মাথায় পাকা চুল, পেটের নীচে ভুঁড়ি ও মুখে থাক-পড়া চিবুক নিয়ে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। তাদের তুলনায় তাঁকে যুবকের দলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এলসিকে ঘরণী ক'রে আনতে আর দেরি করবেন না। ওর সুন্দর মুখের মিষ্ট হাসি, নীল চোখের কোমল দৃষ্টি, স্নেহ-

ভরা হাতের সেবা দিয়ে তাঁর বাকি জীবনটুকু ও সুস্বাদু ক'রে দেবে। এই রিক্ত তিক্ত জীবন আর ভাল লাগছে না। রাত্রে নিঃশব্দ শয়নকক্ষে নিঃসঙ্গ শয্যায় তাঁর রাত যেন কাটতে চায় না। না না, এলসিকে আনতে আর দেরি করবেন না কিছুতেই।

শয়নকক্ষে এলেন। হৈমবতীর তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। সুন্দর হাসিটি ওষ্ঠাধরে স্থির হয়ে আছে। হাসছ? ক্ষমা করেছ? সব ক্রটী, সব বিচ্যুতি? তোমার ক্ষমা-সুন্দর হাসির স্পর্শে সব পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে একদিন জানি, তাই তো এত সাহস। এলসিকে আনি, কি বল? তুমি তো চিরদিনই হৃদয়ের পাটরাণী হয়ে আছ—থাকবে। ওরা তো তোমার দাসী। একা থাকতে পারছি না আর। শূন্য শয্যায় একা থাকতে ভয় করে। নারীর স্নেহ-কোমল হাতের আশ্বাসময় স্পর্শের জন্য প্রাণ-মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। নারীর নরম বুকে ব্যগ্র বাহুবন্ধনে বদ্ধ হবার জন্য সারাদেহ তৃষ্ণায় ছটফট করে।

শয্যায় প্রবেশ করলেন জগদীশপ্রসাদ। কক্ষের উজ্জ্বল আলোটি নিবিয়ে দিলেন। ছোট একটি নীল আলো জ্বেলে দিলেন। অতি মৃদু নীল আলোতে কক্ষটি রহস্যময় হয়ে উঠল।

* * * *

নিঃশব্দ বেগে ভেসে চলেছেন জগদীশপ্রসাদ। কোথায়?

সবিস্ময়ে মন প্রশ্ন করল। আশে-পাশে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি একা নন, কাতারে কাতারে নরনারী ভেসে চলেছে—বন্যা-স্ফীত নদীস্রোতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেনপুঞ্জের মত। জলস্রোত নয়, বায়ুস্রোতও নয়। তা হ'লে সর্বদেহে স্পর্শ অনুভব করতেন। তবে এই দিক্‌চিহ্নহীন অনন্ত বিপুল স্রোত কিসের? মনের মধ্যে কে ব'লে উঠল, জীবন-স্রোত। তাই নাকি? তা হ'লে এলসি কোথায়? চন্দনলাল? মণিমালা? পাশাপাশি নেই কেন তারা?

হঠাৎ ছিটকে পড়লেন। যেন কোন আকাশচারী বিশাল পক্ষী ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে উড়ে চলল। ধীরে ধীরে জীবনানুভূতি স্তিমিত হয়ে এল। এলসি, চন্দনলাল ও মণি-মালার অনুপস্থিতির জন্য মনঃক্ষোভ ফিকে হয়ে এল। শিথিল হয়ে এল জীবনের সঙ্গে বন্ধন; গাঢ় শীতল ঘুমে জীবন-চৈতন্য ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে গেল।

হঠাৎ চেতনার শিখা জ্ব'লে উঠল। অস্ফুট আলোকে দেখলেন, দাঁড়িয়ে আছেন। একা নয়—সারিবদ্ধভাবে অনেক লোক, সামনে ও পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। ঘাড়টা পাথরের মত জমাট হয়ে গেছে। ফেরাতে পারলেন না। দেখতে পেলেন, সামনের লোকটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তিনিও তাই না কি? হ্যাঁ, তাই। কিন্তু লজ্জার উদ্রেক হ'ল

না মোটেই। অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ব'লেই মনে হ'ল। কিন্তু কি জন্য দাঁড়িয়ে আছেন? কলকাতায় রেশনের দোকানে মেয়ে-পুরুষকে চাল-চিনির জন্য কিউ ক'রে দাঁড়াতে দেখেছেন। তাদের অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা ক'রে মনে মনে আত্মপ্রসাদও অনুভব করেছেন। তাঁকেই যে আবার এমন ক'রে কোনদিন দাঁড়াতে হবে, তা তো কোন দিন ভাবেন নি। কিন্তু কিসের জন্য? চাল-চিনির জন্য নয় নিশ্চয়ই। গম্ভীর স্বরে কে ব'লে উঠল, বিচার হবে—

বিচার হবে! কেন? কি করেছেন তিনি? কে বিচার করবে?

যিনি নিখিল বিশ্বের বিচারক—

সাক্ষ্য দেবে কে?

ওই যে, সামনে চেয়ে দেখ—

হঠাৎ সামনে দেখতে পেলেন অনেক লোক দাঁড়িয়ে। এরা সাক্ষ্য দেবে? কে এরা? হঠাৎ দেখতে পেলেন ব্রজলালকে। তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ থেকে ক্রূর প্রতিহিংসা যেন ঠিকরে পড়ছে। পাশে কে? মহাদেও? মহাদেও পাণ্ডে? ওদিকে সেই কম্যুনিস্ট ছোকরা ধীরেন না? তারই কাছে কে ও? নরেন? আর এক দিকে কে ও? সেই কুলীর সর্দার—বনওয়ারীলাল, যাকে বয়লারের মধ্যে পুরে মারা

হয়েছিল ? আর আর সব কে ? কুলী-মজুরের দল ? তাঁর অর্থ-পিপাসা মেটাবার জন্যে যারা কয়লা-খাদের মধ্যে যন্ত্র-দানবের করাল-দংষ্ট্রায় প্রাণ দিয়েছে ! যারা তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়াবার জন্যে দিনের পর দিন প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেছে ! উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিনের পর দিন বাস ক'রে, অর্ধাশনে, নানা রোগে মরেছে ! সকলের মুখেই নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা যেন কঠিন হয়ে রয়েছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে উঠল। কে রক্ষা করবে তাঁকে ? হৈমবতী কই ? তাঁর হৈম, যে একদিন সমস্ত বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিল তাঁকে ? তারস্বরে ডাকলেন, হৈম ! শব্দ ভাল ক'রে ফুটল না। কিন্তু ধীরে ধীরে হৈমর মুখ ভেসে উঠল। মুখের সেই আশ্বাস-ভরা হাসিটি অম্লান হয়ে রয়েছে। ডাকলেন, এস, কাছে এস। মধুর কণ্ঠে বললে, ভয় কি, আমি তো কাছেই আছি তোমার। তোমার কাছ থেকে কি দূরে থাকতে পারি ? বললেন, আমাকে জড়িয়ে ধর, ভয় করছে আমার। বললে হৈম, তোমাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে আছি যে ! ভয় কিসের ?

যেন একটা আলো জ্বলছিল অলক্ষ্যে। নিবে গেল। গাঢ় অন্ধকারে সব ডুবে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল সব। গাঢ় অবসাদে সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল আবার।

আবার আলো জ্ব'লে উঠল। দেখলেন, একটা ঘরে দাঁড়িয়ে

আছেন। সামনে একটা পর্দা। এ আবার কি? কে বললে—ছবি দেখা হবে। কেন? স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে বুঝি? উত্তর এল—হ্যাঁ, দেহের নয়, আত্মার। আত্মার স্বাস্থ্য? কবিতার দাড়ি? বলে কি!

হঠাৎ আলো নিবে গেল। ধীরে ধীরে পর্দার উপরে একটা ছবি ফুটে উঠল। পুরুষমানুষের ছবি। অস্থিকঙ্কালসার, অপরিচ্ছন্ন, মলিন দেহ। সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। মুখটা বিকৃত, বীভৎস। দুই অঙ্গুলিহীন অঞ্জলি মেলে ভিক্ষা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। দুই চোখে ক্ষুধাতুর দৃষ্টি। হঠাৎ সেই কুষ্ঠরোগীটার কথা মনে পড়ল। এ কার ছবি? সেই কুষ্ঠ ভিখিরীটার।

কে ব'লে উঠল, আর কারও নয়, তোমার ছবি। তোমার রূপ নয়—স্বরূপ।

আর্তনাদ ক'রে বলতে গেলেন, আমি কুষ্ঠ ভিখারী! আমি সার্ জে. পি. চ্যাটার্জি। আমি—আমার—

মেঘ-মন্দ্রস্বরে ধ্বনিত হ'ল, চুপ।

ধীরে ধীরে মনুষ্যমূর্তি অস্পষ্ট হয়ে উঠল, শুধু মাঝখানে ফুটে রইল—আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল কতকটা মাংসপিণ্ড, যেন ক্যান্সারাক্রান্ত নারী-স্তন—সবটা রক্ত, পুঁজ, কৃমি-ভরা ঘায়ে দগদগ করছে।

আর্তনাদ করলেন, এ কিসের ছবি ?

কঠোর গম্ভীর স্বরে উত্তর এল, তোমার আত্মার ! চিৎকার করবার চেষ্টা করলেন জগদীশপ্রসাদ। কে সবল মুষ্টিতে গলা চেপে ধরল।

ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছেন জগদীশপ্রসাদ। যেন লিফ্‌টে ক'রে খনির মধ্যে নামছেন। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। খুব দ্রুত নেমে চলেছেন বুঝতে পারছেন। কোথায় নামছেন ? হৈম কৈ ? হৈম ! ডাকবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। কিন্তু হৈমবতীর মুখ ভেসে উঠল পাশেই। তাঁর সঙ্গেই নামতে লাগল সমান বেগে। বললে, ভয় নেই। কাছেই আছি। দুই চোখ অপরিমেয় স্নেহ ও করুণায় ভ'রে বললে, তুমি যা-ই হও, আমার বুকের মধ্যে তোমার আশ্রয় কেউ কেড়ে নিতে পারবে না—

হঠাৎ যেন লিফ্‌টটা থেমে গেল। হৈমর মুখ মিলিয়ে গেল। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠল। মনে হ'ল, যেন বাতাসটা হাল্‌কা হয়ে আসছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। তার পর একটা বিরাট সাঁড়াশির দুটো কঠিন শীতল বাহু দু দিক দিয়ে বুকটাকে সজোরে চেপে ধরল। অপরিসীম যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠলেন জগদীশপ্রসাদ। তার পর চিরদিনের মত তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে সারা শহরে এই সংবাদ বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ল—দেশের কৃতী সন্তান, বিখ্যাত ব্যবসায়ী, কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার, শ্রেষ্ঠী-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীজগদীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ হার্ট-ফেল ক'রে মারা গেছেন।